ছায়াছবি

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শারদীয়া ১৩৩৭

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটির
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

দাম ৯৲

প্রিণ্টার :—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
১৫।এ, ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা।

—কমলকে দিলাম—

ছায়াছবি

কোন্ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা লেখে না। তাঁহাদের বংশাবলীর পরিচয়ও কোনো ইতিহাস প্রণেতার কাছে পাই নাই, অথচ তাহা আমাদের সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

সংগ্রহ না করিলে হয়ত সে বংশের রক্তের ধারার কোনও সন্ধানই মিলিত না।

যে মহাপুরুষের কথা আমরা সর্ব্বাগ্রে উত্থাপন করিতেছি তিনি আমাদের নায়কের পিতামহ। পিতামহ বলিলেই মনে হয় —বৃদ্ধ। বৃদ্ধ যে তিনি এককালে হন নাই তাহা নয়। তাঁহারও একদিন চুল পাকিয়াছিল, দাঁত ভাঙ্গিয়াছিল এবং শেষে একদিন মরিয়াও ছিলেন, কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তিনি যুবক না হইলেও বার্দ্ধক্যের কোঠায় আসিয়া পৌছেন নাই,—প্রৌঢ় বলা চলে।

ছায়াছবি

নাম—বংশলোচন।

পৃথিবীতে এত নাম থাকিতে এ-হেন নামকরণের কারণ—তিনিই পিতার একমাত্র পুত্র—বংশের বংশধর। দেখিতে লম্বা-চওড়া জোয়ান টাঙ্গির মত গোঁফ, বাব্‌রি-কাটা চুল, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা!

মাঝে-মাঝে মাথায় তিনি পাগ্‌ড়ি বাঁধিতেন, ঘোড়ায় চড়িতেন, বিষয়-সম্পত্তি লইয়া কোথাও হাঙ্গামা বাধিলে লাঠি লইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি স্বয়ং সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন।

রতনপুর গ্রামের জমিদার। জমিদারীর এলাকার মধ্যে অতিবড় উদ্ধত প্রজারও টু শব্দটি করিবার জো ছিল না।

কাহারও বাড়ীতে ছাগল ঢুকিয়া গাছপালা খাইয়া দিয়াছে; যাহার গাছ খাইয়াছে সে আসিয়া নালিশ করিল।

বংশলোচন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার ছাগল? কোথায় ছাগল?"

সে হয়ত বলিল, "ছাগল পশুপতি চাটুজ্যের। দুটি ছোট ছোট পাঁঠা। ধরে' নিয়ে এসেছি হুজুর।"

বংশলোচন বাবু ছাগল দুইটি দেখিতে চাহিলেন।

ঘরের মধ্যে ছাগল আর কিছুতেই আসিতে চায় না। যত টানাটানি করে ততই তাহারা চীৎকার করিতে থাকে। অবশেষে অনেক কষ্টে আড়্‌কোলা করিয়া বুকের উপর তুলিয়া ধরিয়া ছাগল

দুটিকে তাঁহার সম্মুখে আনা হইল। বাবু একবার তাহাদের বেশ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। বলিলেন, 'কে আছিস্ রে!'

মাথায় পাগড়ি-বাঁধা হিন্দুস্থানী পেয়াদা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।—'হুজুর!'

'ডাক্ পশুপতিকে।'

গ্রামের মধ্যে পশুপতি দু'জন। এক—পশুপতি চাটুজ্যে, এক—মুখুজ্যে।

পেয়াদা ডাকিয়া আনিল পশুপতি মুখুজ্যেকে।

গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় পশুপতি তখন তাহার ছোট্ট দোকানটির চালায় বসিয়া বেগুনি ভাজিবার উপক্রম করিতেছিল। বেসন-মাখা হাতটা সে ধুইবার অবসর পায় নাই। যেমন বসিয়াছিল তেমনি অবস্থাতেই সে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আসিয়াছে।

তাহাকে দেখিবামাত্র বংশলোচন বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'হারামজাদা, পাজি, ছুঁচো,—দোকান করে' লোকের গলা কেটে কেটে হাতে কিছু পয়সা হয়েছে, না? তারই গরম। ব্যাটা আবার ছাগল পুষেছে! বড়লোক হবার মতলব। এই যে হওয়াচ্ছি বড়লোক,—দাঁড়া!'

বলিয়া তিনি 'সুরো! সুরো!' বলিয়া হাঁকিতে লাগিলেন।

সুরো—ওরেফে সুরেশ। গাছ নষ্ট করার জন্য সে-ই নালিশ করিতে আসিয়াছিল।

বাবুর একজন কর্ম্মচারী বলিয়া উঠিল, 'আজ্ঞে, তাকে আপনি ভৈরব পূজোরীর বাড়ী খাঁড়া আনতে পাঠিয়েছেন।'

'ও! তা ব্যাটা এখনও এলো না কেন?' বলিয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীকেই আদেশ করিলেন, —'তুই যা ত' 'একবার—আমার শোবার ঘরে বালিসের নীচে ছ্যাখ্‌গে একটা খুব ধারালো ভোজালী আছে। নিয়ে আয় সেইটে।'

পশুপতি হাত জোড় করিয়া এই অবসরে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, বাবু চোখ পাকাইয়া প্রচণ্ড এক ধমক্ দিয়া বলিলেন, 'চোপ্!'

অগত্যা সে চুপ করিয়াই রহিল।

কর্ম্মচারী তাঁহার ভোজালীটা আনিয়া হাতের কাছে নামাইয়া দিতেই তিনি তাহা চাম্‌ড়ার খাপ্ হইতে টানিয়া বাহির করিলেন। তাঁহারই এক নেপালী চাপ্‌রাশীর কাছ হইতে অস্ত্রটি তিনি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। চক্‌চকে' ভোজালীটা তিনি নাড়িয়া-চাড়িয়া স্নেহকোমল দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ একগ্রভাবে সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এক চোটে এক-একটা পাঁঠা কেউ পারিস্ কাটতে?'

সকলেই অস্বীকার করিল।—'আজ্ঞে না। সেদিন সেই যে,—আপনি যেমন ক'রে কাটলেন, সেরকম কাটবার ক্ষমতা আমাদের বাবারও নেই।'

'উত্তম!' বংশলোচনবাবু বলিলেন, 'তবে ধর্ তোরা,—মাথার দিকে একজন—পায়ের দিকে একজন।'

উঠানের পাশে থামের একটা খুঁটিতে বাঁধিয়া দুজন দুদিকে

ধরিল। বংশলোচনবাবু তাঁহার সেই চক্‌চকে ভোজালী দিয়া একচোটে একটা পাঁঠা কাটিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'ধর্‌ আর-একটা!'

আবার আর-একটা পাঁঠাকেও ঠিক তেম্‌নি করিয়া ধরা হইল। সেটাও তিনি কাটিয়া ফেলিলেন।

পশুপতি তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। বলিলেন, 'নিয়ে যা একটা মুণ্ডু। বাস্‌! ছাড়বি আর কখনও? পাঁঠা আর কখনও ছাড়বি?'

পশুপতি আবার কি যেন বলিতে যাইতেছিল।

বাবু বলিলেন, 'চুপ্‌, পাজি কোথাকার! কথাটি কয়েচিস্‌ কি এই ভোজালী দিয়ে দেব এইবার তোকেই শেষ করে'।'

পশুপতি চুপ।

'নিলিনে এখনও?'

পশুপতি কি আর করিবে, ধীরে ধীরে পাঁঠার মুণ্ডুটি হাতে লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। এমন সময় ভৈরব পূজারীর বাড়ী হইতে খাঁড়া লইয়া সুরেশ আসিয়া হাজির!

পশুপতির হাতে পাঁঠার মুণ্ডু দেখিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল। বলিল, 'এ পশুপতি ত' নয় হুজুর, পশুপতি চাটুজ্যে।'

বংশলোচন বাবু হাসিলেন। পশুপতি মুখুজ্যের মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'তবে রে ব্যাটা, তাই বুঝি পাঁঠার মুণ্ডুটি হাতে নিয়ে চুপি চুপি পালাচ্ছ? রাখ্‌ বল্‌ছি হারামজাদা, রাখ্‌!—কে আছিস্‌?'

আবার পেয়াদা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

বংশলোচন বাবু বলিলেন, 'তো-বেটারা কোনও কাজেরই নোস্ দেখছি। ছাতুখোর বেটারা শুধু খেতেই বাহাদুর! পশুপতি মুখুজ্যে নয়—পশুপতি চাটুজ্যেকে ডাক্।'

পেয়াদা আবার ছুটিল।

এই অবসরে বংশলোচনবাবু সুরেশকে একচোট্ শাসাইয়া লইলেন।—'তুই হারামজাদাও ত' তেমনি! ভাল করে' কই বলেও ত' দিলিনে!'

বাবুর মেজাজ সুরেশ খুব ভাল করিয়াই জানে। কাজেই দু'পাটি দাঁত বাহির করিয়া নীরবে শুধু একবার হাসিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

পাঁঠা দুইটা অন্দর মহলে পাঠাইয়া দিয়া শুধু মুণ্ডু দুইটা সেইখানে রাখিতে বলিয়া বংশলোচন বাবু আবার তাঁহার বসিবার ঘরে আসিয়া বসিলেন।

বসিয়া বসিয়া গড়গড়ার নল টানিতেছেন, এমন সময় হন্তদন্ত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে পশুপতি চাটুজ্যে আসিয়া হাজির!

বংশলোচন বাবু গম্ভীর ভাবে তাঁহার কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন,—'নিয়ে আয় পাঁঠার মুণ্ডু দুটো। দে এই ব্যাটাকে।'

মুণ্ডু দুইটির কানে ধরিয়া তুলিয়া আনিয়া কর্ম্মচারী মহাশয় পশুপতির পায়ের কাছে নামাইয়া দিল। বলিল, নিয়ে যান্।

পশুপতি অবাক্!

বংশলোচন বাবু বলিলেন, 'চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলি যে?

চিন্‌তে পারিস—কার ছাগল? ছাগল পোষবার বেলায় আগ্‌লাবার কথা আর মনে থাকে না। না? সকাল থেকে ছেড়ে দিবি, পরের গাছপালা খেয়ে খেয়ে বেড়াবে,—নে, ওই তার উপযুক্ত শাস্তি।'

হেঁট্ মুখে কাটা-ছাগলের মুণ্ডু দুইটির পানে পশুপতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। সে আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না।

বাবু বলিলেন, 'নিয়ে যা মুণ্ডু দুটো। তাড়াতাড়ি পালা বলছি। আমার চোখের সুমুখ থেকে, নইলে কিছু বাকি রাখব না বলে' দিচ্ছি।'

বাকি হয়ত তিনি সত্যই রাখিবেন না। তবু পশুপতি পালাইতে পারিল না। একটি ছাগল সে রাখিয়াছিল তাহার ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার জন্য, আর একটি মা দুর্গার মানসিক। তিন-তিনটি ছেলে মরিয়া এই ছেলেটি তাহার বাঁচিয়াছে, তিন মাস বয়সের সময় অসুখ হইয়া সেও যায় যায় হইয়াছিল, মা দুর্গার কাছে তাহারই জীবন ভিক্ষা করিয়া একটি পাঁঠা সে দিবে বলিয়াছে।

দুইটি পাঁঠাই গেল। অবস্থা তাহার এত ভাল নয় যে, ইচ্ছা করিলেই দুই দুইটি ছাগল সে একসঙ্গে কিনিতে পারে!

অথচ এ বিচারের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার জো নাই।

পশুপতির চোখ দুইটা ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

কিন্তু বংশলোচন বাবুর দৃষ্টি সেদিকে পড়িল না। হঠাৎ এক সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন, না, না, দুটো মুণ্ডু তুই নিয়ে

যাবি কি রকম ? তোর একটা, আর ওই যার গাছ খেয়েছে—সুরোর একটা। দু'জনের দুটো।

সুরো ওরফে সুরেশ তখন আহ্লাদে আটখানা হইয়া তৎক্ষণাৎ একেবারে ঠিক চিলের মত ছোঁ মারিয়া পাঁঠার মুণ্ডু সেখান হইতে তুলিয়া লইয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কয়েকটি পুঁইএর পাতা এবং লঙ্কার একটি গাছ মাত্র তাহার ছাগলে খাইয়াছিল।

এখন যদি প্রত্যহই তাহার লঙ্কা ও পুঁইএর গাছ ছাগলে খায়—তাহাতেই বা ক্ষতি কি !

এ ত' গেল সামান্য ব্যাপার !

ইহা ছাড়াও রতনপুর গ্রামের মধ্যে এমন সব ব্যাপার ঘটে যাহা শুনিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

বংশলোচন বাবুর হুকুম—বাড়ীর সুমুখে কেহ বড় প্রাচীর তুলিতে পাইবে না। বাবু যখন গ্রামের পথে বেড়াইতে যাইবেন তখন যেন প্রত্যেকটি গৃহস্থালীর সজীব এবং নির্জ্জীব যাবতীয় পদার্থ তাঁহার নজরে পড়ে।

এ হুকুমের উদ্দেশ্য যে কি তাহা সকলেই জানে।—তাহা যেমন বীভৎস তেমনি কুৎসিত। তথাপি কেহ ইহার প্রতিবাদ করে না, ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার মত সাহস এবং শক্তি কাহারও নাই। নীরবে মাথা পাতিয়া এ হুকুম সকলেই মানিয়া লয়, নিতান্ত নিভৃতে নিরালায় হয়ত এ আচরণের নির্ম্মমতা এবং নৃশংসতা লইয়া তাহাদের দু'একজনের মধ্যে আলোচনাও চলে, হয়তঃ তাহারা কেহ কেহ সপরিবারে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায়,—হয়ত-বা

ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রসঙ্গে মনের দুঃখে নিতান্ত তীব্র ভাষায় বাবুকে তাহারা গালি-গালাজ করিতে থাকে।

কিন্তু ওই পর্য্যন্তই।

তাহার বেশি অগ্রসর হওয়া দূরে থাক্, নিশ্চিন্ত নীরবে সকলেই তাহা সহ্য করিয়া পরমানন্দে দিন কাটায়।

অসমর্থ অক্ষমের একমাত্র ভরসা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ বলাবলি করে, 'তিনিই মালিক। তিনিই দেখবেন।

মালিকের নজর কিন্তু অতদূর পৌঁছায় কিনা কে জানে।

যুবতী এবং সুন্দরী নারীর সন্ধান পাইবামাত্র তাহার বাড়ীর দরজায় বংশলোচন বাবুর পাল্‌কী গিয়া দাঁড়ায়। পাল্‌কীর ভিতর হইতে বাবুর বাড়ীর ঝি নামিয়া আসে। বাড়ীর ভিতর গিয়া বলে, 'রাণী-মা যেতে বলেছেন মা, চলো।'

রাণী-মার হুকুম! সুতরাং 'না' বলিবার উপায় নাই।

কেহ-বা স্বেচ্ছায় যায়। কেহ-বা অনিচ্ছায়।

কেহ-বা কান্নাকাটি সুরু করে।

যে মেয়ে যাইতে চায় না, বাবুর বাড়ী হইতে তাহার অভিভাবকদের ডাক পড়ে।

কেহ পায় পুরস্কার, কেহ-বা পায় তিরস্কার।

তখন আর মেয়েদের কিছু বলিবার থাকে না। হেঁটমুখে রাণীমার সঙ্গে দেখা করিতে যায়।

ফিরিয়া আসিয়া কেহ বা আবার যাইতে চায়, কাহারও বা কাঁদিয়াই জীবন কাটে।

ছায়াছবি

গ্রামে এক থিয়েটার পার্টি খোলা হইয়াছে।

উৎসাহ বংশলোচনবাবুরই সব চেয়ে বেশি।

নিজে টাকা খরচ করিয়া তাঁহার বাড়ীর সুমুখে বাঁধানো 'ষ্টেজ্' তৈরী করাইলেন, কলিকাতা হইতে 'সিন্' আসিল' সাজ-পোষাক আসিল, এবং তাহার পর মাসে তিনবার করিয়া একই নাটক অভিনীত হইতে লাগিল।

মেয়েদের দেখিবার জায়গা আলাদা,—পুরুষদের আলাদা।

তাহার পর হঠাৎ একদিন একটা বড় অঘটন ঘটিল।

মহা সমারোহে থিয়েটারের অভিনয় চলিতেছে। সহসা এক সঙ্গে সমস্ত আলো নিবিয়া গেল। হৈ চৈ করিয়া একটা গোলমাল উঠিল। 'আলো' 'আলো' করিয়া এদিক-ওদিক লোকজন ছুটা-ছুটি করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার আলো জ্বলিল। আবার অভিনয় চলিল।

কিন্তু অভিনয় শেষ হইলে শোনা গেল, রসিক অধিকারীর পুত্রবধূকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কিশোরী বধূ। সবে এই সেদিন তাহার বিবাহের পর দ্বিরা গমনে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। পরমা সুন্দরী মেয়ে—গায়ে এক-গা গয়না পরিয়া বুড়ী পিসি-শ্বাশুড়ীর সঙ্গে থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিল। বুড়ী চোখে ভাল

দেখিতে পায় না। মেয়েদের জায়গা হইতে থিয়েটারের 'ষ্টেজ্' পর্য্যন্ত তাহার নজর চলিতেছিল না বলিয়া বৌকে কোলের কাছে বসাইয়া নিজে সে সংরঞ্চের উপর জড়োসড়ো হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মেয়েদের ঠেলাঠেলি চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখে, থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেছে, যে যার বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুড়ীও চোখ রগ্ড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ভিড়ের মধ্যে বৌ বৌ করিয়া চেঁচাইয়া ইহাকে-উহাকে বৌ বলিয়া ধরিতে লাগিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বৌকে আর খুঁজিয়া পাইল না। ভাবিল, নিশ্চয়ই সে কাহারও সঙ্গে বাড়ী চলিয়া গেছে।

বাড়ী ফিরিয়া দেখে, সত্যই তাই।

বৌ তাহাদের বাড়ী ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু কাহার সঙ্গে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দেয় না, হেঁট মুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে দর্ দর্ করিয়া চোখ দিয়া জল গড়ায়।

বুড়ী অত সব দেখিতেও পায় না, বুঝিতেও পারে না, ভাবে, হয়ত রাত জাগিয়া বৌএর ঘুম পাইয়াছে। বলে, 'শ্বশুর তোমার ও-ঘরে শুয়েছে বাছা। সে-ছোঁড়া যে কখন আসবে তার ঠিক নেই, তুমি যাও বাছা ওপরে গিয়ে বিছানা পেতে শোওগে যাও!'

সে-ছোঁড়া অর্থাৎ বুড়ীর ভাইপো, বৌএর স্বামী—থিয়েটারে অর্জ্জুন সাজিয়া অভিনয় করিয়া, অভিনয়ান্তে অন্যান্য অভিনেতাদের সঙ্গে সবেমাত্র তখন মদ্যপান সুরু করিয়াছে। বাড়ী ফিরিতে তাহার দেরি হইবারই কথা।

ছায়াছবি

মুখে 'পেণ্টে'র দাগ তখনও ঘুচে নাই, চোখ দুইটা লাল, টলিতে টলিতে বাড়ী যখন সে ফিরিল তখন সূর্য্য উঠিয়াছে। বুড়ী পিসিমা প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে সদর দরজার চৌকাঠে গোবর-জল ছিটাইয়া বাসি বাসনের গাদা পুকুরে মাজিতে যাইতেছিল, বলিল, 'এলি? যা এবার সকাল-সকাল বেশ ভাল করে' তেল মেখে চান করে' আয়, আমি চারটি রেঁধে দিই, রাত জেগেছিস্, খেয়ে-দেয়ে ঘুমো বাছা, আর যাস্‌নে কোথাও।

প্রকাশ বক্তৃতার সুরে হাত নাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বাক্য তব সংবর জননী!'

বলিয়া হাসিতে হাসিতে টলিতে টলিতে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

ঘরে ঢুকিয়াই এ-ঘর ও-ঘর করিয়া প্রকাশ তাহার স্ত্রীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। ভাবিয়াছিল, স্ত্রী তাহার নিশ্চয়ই এতক্ষণ শয্যাত্যাগ করিয়া কাপড় কাচিয়া বসিয়া আছে।

নীচের ঘরে কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া প্রকাশ সিড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কাল তাহার বক্তৃতা কেমন হইয়াছে, কেমন তাহাকে মানাইয়াছিল সেই কথাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে।—মদের গন্ধ? তা হোক্ সে কৈফিয়ৎ তাহাকে সে আগেই দিয়া রাখিয়াছে। রাত্রি জাগিয়া থিয়েটার যাহাদের করিতে হয়, এক-আধটু মদ তাহাদের না খাইলে চলে না।

এম্‌নি সব নানান্ কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রকাশ উপরে উঠিয়া গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে যুগপৎ বিস্ময়ে ও হতাশায় স্তব্ধ হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। মুখ দিয়া কথা বাহির হইল

না, পা দুইটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মদের নেশা তাহার তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একটুখানি আগাইয়া গিয়া দেখিল, নব পরিণীতা সুন্দরী বধূ তাহার খড়ো-ঘরের চালের একটা বর্গার গায়ে কাপড় বাঁধিয়া গলায় ফাঁসি লট্‌কাইয়া শূন্যে ঝুলিতেছে। পায়ের নীচে তাহার টিনের তোরঙ্গ-টাকে টানিয়া আনা হইয়াছে, এবং তাহারই চতুর্দ্দিকে স্তূপীকৃত বিছানা বালিশগুলা চাপাইয়া সে ওইখানে গিয়া উঠিয়াছে, তাহার পর সেগুলা সে পা দিয়া সরাইয়া ফেলিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। গায়ে এক-গা গয়না, পরণে সেই যে শাড়ীখানি পরিয়া সে কাল থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল তাহাই রহিয়াছে। কিন্তু শাড়ীর যেখানে-সেখানে ছেড়া জামাটাও ছিঁড়িয়াছে। এমন করিয়া সে তাহার জামা কাপড় ছিঁড়িল কেন কে জানে। মাথার খোঁপা আল্‌গা হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে, চুলগুলা ধূলায় ভর্ত্তি। চোখে জল, জিবটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কাপড়ে রক্তের দাগ !

প্রকাশ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কি জন্য সে আত্মহত্যা করিয়াছে কিছুই ভাল বুঝিতে পারিল না। গত রাত্রে যখন সে থিয়েটার দেখিতে যায় তাহার সঙ্গে সে হাসিয়া কথা বলিয়াছে। ঝগড়া-ঝাঁটি দূরের কথা, নব-বিবাহিতা পরমা সুন্দরী পত্নী তাহার,—আদর যত্ন ভালবাসার আর অন্ত নাই ! ভালবাসার সুখ-স্বপ্নে বিভোর এই নব দম্পতীর প্রেমালাপ যেন ফুরাইতেই চাহিত না। কথা কহিতে কহিতে

আদর-সোহাগ করিতে করিতে এই সেদিনও তাহাদের রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে। দিনের বেলা দেখা শোনা কম হয় বলিয়া সাগ্রহে তাহারা সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিয়াছে। আবার রাত্রিটা বড় তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যায় বলিয়া ভগবানের কাছে অভিযোগ করিয়াছে। পরস্পর পরস্পরের কাছ হইতে জীবনের আর কোনো-দিন বিচ্ছিন্ন হইবে না বলিয়া উভয়ে কত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।—এ ত' তাহার আত্মহত্যা করিবার সময় নয়!

কাঁদিতে কাঁদিতে প্রকাশ নীচে নামিয়া আসিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল,—'পিসি! পিসি! বাবা!'

পিসি তখনও পুকুরের ঘাট হইতে ফিরে নাই। রসিক গিয়া-ছিল—গাই দোহাইবার জন্য লোক ডাকিতে।

বিশে বাগ্দীকে সঙ্গে লইয়া রসিক ঘরে ঢুকিয়াই পুত্রের এ-হেন অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে? কি হলো প্রকাশ?'

প্রকাশ যাহা বলিল শুনিয়া ত' রসিকের চক্ষুস্থির!

পিতাপুত্রে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল।

বিশে বাগ্দীর দুধ দোয়ানো আর হইল না। তাহারই মুখে সংবাদ পাইয়া দলে দলে গ্রামের লোক আসিয়া রসিক অধিকারীর উঠানে জড়ো হইতে লাগিল।

রসিকের বৃদ্ধা দিদি তখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে।—'ওলো হতভাগী লো, তোর মনে শেষে এই ছিল লো!'

কিন্তু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া লাভ নাই। পুলিশে জানিতে পারিলে এখনই হয়ত মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বসাইবে, এখনই

হয়ত ওই হতভাগীর মৃতদেহ লইয়া টানাটানি ছেঁড়াছেড়ির আর অন্ত থাকিবে না।

সুতরাং এ-সময় আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া হুজুরের শরণাপন্ন হওয়াই ভালো। ভাবিয়া পিতাপুত্রে তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে রওনা হইল।

সংবাদটা শুনিবামাত্র বংশলোচনবাবু প্রথমে একটুখানি চমকিয়া উঠিলেন বলিয়াই মনে হইল। পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'চল্ দেখে আসি।'

এত অনুগ্রহ বাবু সহজে কাহাকেও করেন না।

রসিক তাঁহার এই করুণায় বিমুগ্ধ হইয়া গিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, রক্ষা করুন হুজুর, পুলিশের হ্যাঙ্গামায় যেন না পড়তে হয়।'

বংশলোচনবাবু কি ভাবিয়া যেন একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন। রসিককে হাতে ধরিয়া তুলিয়া দিয়া প্রকাশকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মলো—গলায় দড়ি দিয়ে? কেন মলো বল্ দেখি? ঝগড়া ঝাঁটি কিছু হয়েছিল? চিঠিপত্র কিছু লিখে রেখে যায়নি?'

চোখের জল মুছিয়া প্রকাশ বলিল, 'আজ্ঞে না।'

খুঁজে পেতে সব দেখেছিস্ ভাল করে?'

রসিক বলিল, 'বৌমা আমাদের লিখতে জানতো না। না রে প্রকাশ?'

জানিত কিনা প্রকাশ তাহা নিজেই জানে না.। নিজে ভাল লিখিতে পড়িতে পারিত না বলিয়া স্ত্রীকে প্রকাশ কোনোদিন চিঠিও লেখে নাই, সে কথা তাহাকে কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করে নাই। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আজ্ঞে না, কই লেখাপড়া সে জানতো না বোধহয়।'

বংশলোচন বাবু ধমক্ দিয়া উঠিলেন, 'বোধহয় কি রে হতভাগা, বোধহয় কি রকম ? তুই স্বামী তুই জানিস না ?'

ধমক্ খাইয়া প্রকাশ এইবার জোর করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আজ্ঞে না, বোধহয় জানতো না। জানতো না সত্যিই।"

'তাই বল্।' বলিয়া আশ্বস্ত হইয়া বাবু এইবার সত্যই তাহাদের সঙ্গে চলিলেন।

সঙ্গে গিয়া রসিক অধিকারীর মৃতা বধূকে দেখিয়া একটুখানি দুঃখ প্রকাশ করিলেন, তাহার পর হুকুম দিলেন, 'যা, শ্মশানে একে জ্বালিয়ে দিয়ে আয়।'

লোকজন যাহারা সমবেত হইয়াছিল তাহারা যেন একথা কোনোদিন ভুলিয়াও পুলিশের কাণে তুলিয়া না দেয় তাহার জন্য প্রায় প্রত্যেককেই সাবধান করিয়া দিয়া বংশলোচনবাবু নিশ্চিন্তমনে সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সব শেষ হইয়া গেল।

প্রতিমার মত বৌমাকে তাহার চিতায় তুলিয়া দিয়া রসিক অধিকারী কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীর ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া প্রকাশ কাঁদিল।

তাহারপর তাহার সে মৃতদেহ পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিল।

অভাগীর আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ কিন্তু কেহই বুঝিতে পারিল না।

বুঝিতে কেহ না পারিলেও গ্রামের মেয়ে-মজলিসে কানা-ঘুষা চলিতে লাগিল।

কানা-ঘুষা চলিতে লাগিল এই ব্যাপার লইয়াই।

তাহাদের কাছে ব্যাপারটা নাকি দিবালোকের মতই স্পষ্ট।

আত্মহত্যা মানুষ সহজে করে না—

মনের চরম দুঃখেই করে।

তায় আবার সে ছেলেমানুষ !

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, থিয়েটার দেখিবার সময় এক-গা গয়না পরিয়া প্রকাশের বৌ নাকি তাহাদের পাশেই বসিয়া ছিল। আলো নিবাইয়া যাইবার পর হইতে তাহারা আর তাহাকে দেখিতে পায় নাই। বুড়ী পিসিমা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল।

এবং হঠাৎ একসঙ্গে এমন করিয়া সব আলো নিবাইবার কারণ যে কি, সেকথা বলাই বাহুল্য।

আবার কেহ-বা চোখ টিপিয়া চুপি-চুপি বলে, 'কাজ কি বোন্, আমাদের অত-সব কথায় কাজ কি! মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তুলে নিয়ে যেতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

আর-একজন হয়ত' সায় দেয়,—'বাঘ যেমন করে' শীকার তুলে নিয়ে যায়, ঠিক্ তেম্‌নি করে'।

যাই হোক, ব্যাপারটা যেন তাহাঁদের কাছে কিছুই নয়।

ইহার জন্য আত্মহত্যা করা তাহার উচিত হয় নাই।

সরোজিনী বলিল, 'যেরকম সুন্দরী মেয়ে, তাতে এ-কাণ্ড যে একদিন হবেই তা আমি আগেই বলেছিলাম।'

আলোচনাটা এম্‌নি করিয়া মেয়েদের মুখে-মুখে ঘুরিতে ঘুরিতে দিন-কয়েকের মধ্যেই পুরাতন হইয়া গেল।

পুরাতন হইল সকলের কাছেই।

রসিকও ভুলিল, প্রকাশও ভুলিল। এমন-কি বুড়ী পিসিমা তাহাদের কান্নাকাটি ভুলিয়া ঘরে আবার একটি নূতন বৌ আনিবার জন্য ভাইকে তাহার ক্রমাগত তাগাদা দিতে লাগিল।

তাহারই বা দোষ কি!

বুড়া মানুষ! একা সে ঘরকন্না দেখেই বা কেমন করিয়া!

কাঁদিয়া বলে, 'আমরা আর ক'দিনই বা বাঁচব ভাই, যা গেছে তা গেছে, ও নিয়ে আর ভেবে কি করব বল্!'

রসিক বলে, 'প্রকাশকে তুই শুধিয়ে একবার দেখিস্ দিদি।'

প্রকাশকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। থিয়েটারে নূতন নাটকের রিহার্শ্যাল্ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেদিন সে নিজেই বলিল, 'বাবাকে তুই বল্ পিসি, মেসো-মশাইএর কাছে একবার সে বেড়াতে বেড়াতে কল্‌কাতায় যাক্।'

পিসি জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন বল্ দেখি বাছা?'

মুখ ভ্যাংচাইয়া প্রকাশ বলিল, 'কে-ন? বুড়ী যেন ন্যাকা! ঘর-সংসার করতে হবে আমায়, না এম্‌নি তোদের নিয়েই আমার জীবন কাটবে?'

আহ্লাদে আট্‌খানা হইয়া বুড়ী বলিল, 'তাই বল্ বাছা, তোর বাবাও শুধু তোর 'অপিক্ষে'য় বসে' আছে। রসিককে আমি কালই পাঠাব।'

কাল না হোক্, দিন চার-পাঁচ পরেই রসিক অধিকারী কলিকাতা রওনা হইল।

কলিকাতায় তাহার ভায়রা-ভাই থাকেন ভবানীপুরে। হাই-কোর্টের নামজাদা উকিল। জানাশোনা লোকজনের অভাব তাঁহার নাই।

বৌমার শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদে দুঃখিত এবং মর্ম্মাহত হইয়া পরদিন হইতেই তিনি মেয়ে দেখা সুরু করিয়া দিলেন। এবং দশ-পনরটি মেয়ে দেখিবার পর একটি মেয়ে তাঁহাদের পছন্দ হইল।

ছায়াছবি

মেয়েটির নাম—অপরাজিতা। বয়স ষোলো-সতেরো। বাড়ন্ত গড়ন। লেখাপড়া বেশ ভালই জানে। হারমোনিয়াম বাজাইয়া গানও গায়, আবার কোমর বাঁধিয়া ভাতও রাঁধে।

বাপ গরীব, কাজেই পাড়াগাঁয়ে মেয়ের বিবাহ দিতে তাঁহার আপত্তি নাই। বলিলেন, 'মেয়ে আমার স্বামীর সুখে দুবেলা দুটি খেতে পেলেই যথেষ্ট।'

রসিক বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, খাবার পরবার আপনাদের মা-বাপের আশীর্ব্বাদে অভাব আমার নেই। অভাব শুধু লোকজনের। যাকে আমার ঘর-সংসার দেখে নিতে হবে।'

তা ঘর-সংসার দেখিয়া লইবার মত মেয়ে বটে!

প্রকাশের কপাল ভাল। স্ত্রী-ভাগ্য এক-একটা লোকের এম্‌নিই হয়। বৌ তাহাদের কখনও খারাপ হয় না। নিজে সে যেমনই হোক্।

মেয়ের বাপের চেয়ে ছেলের বাপের তাড়া বেশি।

কাজেই দেরি বিশেষ হইল না।

পরের দিনই অপরাজিতার বাবা ভাবী বৈবাহিকের সঙ্গে রতন-পুর রওনা হইলেন।

রওনা হইবার সংবাদ প্রকাশ আগেই পাইয়াছিল।

কাজেই বেশ-ভূষার ত্রুটি হয় নাই। শ্বশুর আসিয়া জামাই দেখিলেন,—চুল-পাড় ফর্সা ধুতির উপর জাপানী-সিল্কের গেঞ্জি গায়ে, পায়ে জরিদার নাগ্‌রা, গোঁফ-দাড়ি একেবারে চাঁছিয়া কামানো, মাথায় ঢেউ-খেলানো চুল, দিব্যি সুস্থ সবল

চেহারা! কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র বাপ! হাতে আকাশের চাঁদ পাইলেন।

তবু শহরে মানুষ-করা লেখাপড়া-শেখানো মেয়ে তাঁহার,—চোখের চশমাটা কপালের উপর তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কতদূর পড়েছ বাবা?'

প্রকাশ বিরক্তিসহকারে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া নকল-গলায় জবাব দিল, 'ম্যাট্রিক্।'

বাপ তাড়াতাড়ি ঢাকিয়া লইতেছিল,—'আমরা সব—পাড়া-গাঁয়ের চাষী-বাসী লোক—বুঝছেন কিনা—চাষ-বাস আছে, ঘরে গাইগরু আছে, পুকুরে মাছ আছে, বাগানে ফল—বুঝতেই ত' পারছেন, লেখাপড়ার রেয়াজ আমাদের দেশে—'

বলিয়া গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার বলিলেন, 'বেশি লেখাপড়া শেখা মানেই—বুঝেছেন কি না, বাড়ী ছেড়ে বাইরে গিয়ে চাকরি ত' [কোথাও—আপনাদের মা-বাপের আশী-র্ব্বাদে—'

বেশি কিছু বলিতে হইল না, ঘাড় নাড়িয়া বৈবাহিক তাঁহার সম্মতি জানাইলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, ঠিক কথাই বলেছেন দাদা। জমিজমা, ঘর-বাড়ী, পুকুর-বাগান, আমরাও শহরে চিরকাল ছিলাম না দাদা, আমারও ঠাকুরদাদার আমলে—।' বলিয়া ঢোক্ গিলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

গরজ উভয় পক্ষেরই সমান।

পরের মাসে দিনস্থির হইয়া গেল।

এবং নির্দ্ধারিত দিনে বিবাহ শেষ হইয়া গেলে অপরাজিতাকে লইয়া প্রকাশ বাড়ী ফিরিল।

দিব্যি ডাগর-ডোগর মেয়ে, কথাবার্ত্তা চমৎকার,—প্রকাশ তাহার মনে-মনে বোধকরি ঠিক এম্‌নিটিই চাহিয়াছিল।

প্রথমা বধূর লজ্জা ভাঙ্গাইতে প্রকাশের অনুনয়-বিনয় আদর সোহাগের আর অন্ত ছিল না, অথচ অপরাজিতার দেখিল—সে বালাই নাই। কথাবার্ত্তা সকলের সুমুখেই বেশ পরিষ্কারভাবে বলে।

দিন-কয়েক পরে প্রকাশ সেদিন রাত্রে তাহার প্রথমা পত্নীর বাক্স-প্যাঁট্‌রা কাপড়-গয়না যাহা-কিছু ছিল অপরাজিতাকে দিয়া বলিল, 'এগুলো তুমি ব্যবহার কোরো। এসব এখন তোমারই।'

অপরাজিতা সবই শুনিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'দিদির ফটো নেই?'

প্রকাশ বলিল, 'না।'

অপরাজিতা বলিল, 'আহা, থাকলে বেশ হতো কিন্তু,—দেখতাম।'

প্রকাশ বলিল, 'হাজার হ'লেও পাড়াগেঁয়ে অসভ্য—ছবি যে কেমন করে' তোলা হয় তাই হয়ত জানতো না।'

অপরাজিতা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'হ্যাঁগা, তোমার নিজের ফটো আছে ?'

ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ 'হ্যাঁ' বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এত বড় মিথ্যা কথাটা সে বলেই বা কেমন করিয়া! যদি দেখিতে চায়!— ঘাড় নাড়িয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'না। ছিল একটা, কিছুদিন আগে তুলিয়েছিলাম, খারাপ হয়ে গেছে। তারপর আর তোলাইনি। ছবি তোলাতে আমি ভালও বাসিনে।'

অপরাজিতা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল। বলিল, 'দিদি খুব সুন্দরী ছিল। না ?'

অপরাজিতা পাছে ক্ষুন্ন হয় ভাবিয়া প্রকাশ বলিল, 'হ্যাঁ—ছিল। —ছিল বটে, তবে...'

'তবে কি ?'

'তবে তোমার চেয়ে নয়।'

কথাটা অপরাজিতার ভাল লাগিল না। বলিল, 'ছি, এ তোমার মন-রাখা কথা। আমার চেয়ে লক্ষগুণে সুন্দরী সে ছিল—সেকথা আমি হাজার লোকের মুখে শুনেছি।—আচ্ছা হ্যাঁগা, কেন সে মলো তা তোমরা কেউ বুঝতে পারলে না ?'

'না।'

'এই ঘরে মরেছিল, না ?'

'হ্যাঁ, ওইখানে।' বলিয়া আঙুল বাড়াইয়া প্রকাশ জায়গাটা দেখাইয়া দিল।

অপরাজিতা শিহরিয়া উঠিল।—'মাগো! আমি আর একা এঘরে ঢুকতে পারব না কিন্তু।'

প্রকাশ বলিল, 'তুদিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভয় কিসের?' বলিয়া কথাটাকে পাল্‌টাইয়া দিবার জন্য প্রকাশ তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'হ্যাঁগা, আমাদের থিয়েটার একদিন দেখবে বলছিলে—দেখবে না?'

অপরাজিতা হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখব।'

'কিন্তু তোমরা কলকাতার মেয়ে। কত ভাল-ভাল থিয়েটার দেখেছ, আমাদের এ থিয়েটার কি তোমার ভাল লাগবে?'

অপরাজিতা বলিল, 'লাগবে। তোমার অর্জ্জুনের বক্তৃতা আমায় শোনাতে হবে। শোনাও না এক্ষুনি—শুনি।'

'পাগল! ষ্টেজ্ না হ'লে সুবিধে হয় না। সাজ-পোষাক না পরলে কি বক্তৃতা হয়?'

'খুব হয়। তুমি বল। না, তোমায় বলতেই হবে।'

প্রকাশের লজ্জা করিতেছিল। বলিল, 'তুমি একটি গান শোনাও আগে।'

ভাবিয়াছিল, গান হয় ত' শুনাইবে না। তাহা হইলে তাহার বক্তৃতাও বন্ধ হইবে। কিন্তু অপরাজিতা বলিয়া বসিল।—'আমি গান গাইলে তুমি বক্তৃতা শোনাবে বল?'

'হ্যাঁ শোনাব।'

'কি গাইব বল।'

'সেই যে সেই বাসর-ঘরে যে গানটা গেয়েছিলে।'

'ও।' বলিয়া মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিয়া অপরাজিতা আরম্ভ করিল,—'হে ক্ষণিকের অতিথি।'

গান শেষ করিয়া বলিল, 'বল তুমি।'

প্রকাশকেও বক্তৃতা করিতে হইল। বলিল, 'জোরে জোরে হবে না কিন্তু, বাবা শুনতে পাবে। দাঁড়াতেও পারব না। শুয়ে শুয়েই বলি।' বলিয়া হাত নাড়িয়া আরম্ভ করিল,—

'চাহিনা সাহার্য্য তব সুৎপুত্র রাধার নন্দন!'

অপরাজিতা বলিল, 'কি বললে? সাহার্য্য?'

'হ্যাঁ।'

.'না, না, সাহার্য্য নয়—সাহায্য। সুৎপুত্র কেন হবে? সূত-পুত্র।'

প্রকাশ বলিল, 'ধেৎ! আমাদের বইএ যা লেখা আছে তাই ত' বলব! আনব? পার্টের খাতাখানা আনব? দেখতে চাও?'

অপরাজিতা বলিল 'খাতা যিনি লিখেছেন তিনি ভুল লিখেছেন হয়ত।'

প্রকাশ হারিতে চায় না। বলিল, 'গাইরি আর-কি!—বাবু আমাদের—জমিদারবাবু, তিনিও ত' ঠিক এম্‌নি করেই বলেন। সে বাবা একেবারে ঘুঘু-ছেলে। কলকাতার কত বড় বড় এ্যাক্‌টার —তার কাছে হেরে যায়। তা জানো?'

কথায় কথায় 'বাবু'র কথা আসিয়া পড়ায় বক্তৃ-তার ভুল-ত্রুটির কথা চাপা পড়িল। অপরাজিতা ইচ্ছা করিয়াই চাপা দিল। বলিল,—'তা হবে। হয়ত আমারই ভুল। আমিই তাহলে ভুল

শিখেছিলাম। আচ্ছা, হ্যাঁগা, তোমাদের এই জমিদারবাবুটি কেমন? শুনলাম নাকি খুব অত্যাচারী?'

প্রকাশ বলিল, 'কে বললে?'

'তা কি আর আমি জানি? আসবানাত্র ছুটি মেয়ে আমায় সাবধান করে' দিয়েছে। বলেছে, রাণী-মা ডাকছেন বলে' পাল্‌কি করে' নিতে এলে তুমি যেন যেয়ো না ভাই! হ্যাঁগা, ব্যাপার কি বল ত?'

প্রকাশ বলিল, 'ধেৎ! সব মিছে কথা। আমাদের গাঁয়ের মেয়েগুলো ভারি বজ্জাত। তবে বড়লোকের ছেলে, স্বভাব-চরিত্তির এক-আধটু—তাই বলে' লোকে যতখানা বলে ততখানা নয়। রাণী-মা আমাদের বড় ভালমানুষ। গাঁয়ের মেয়েদের সব পাল্‌কি করে' নিয়ে গিয়ে আলাপ করেন, কাপড় দেন, গয়না দেন—কত লোককে যে কত টাকা দিয়েছেন তার ঠিক নেই। এই ধরো, সেদিন আমাদের নতুন পালা খোলবার জন্যে পাঁচশ' টাকার ড্রেস্ দরকার হলো। আমরা দরখাস্ত করলাম। রাণী-মা তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিলেন। আমার বক্তৃতা শুনে তাঁর এত ভাল লেগেছে, সেদিন এক সোনার মেডেল দিয়েছেন। দেখবে?'

বলিয়া প্রকাশ তাহার সোণার মেডেলটি দেখাইবার জন্য উঠিতে যাইতেছিল, অপরাজিতা বলিল, 'থাক্, কাল দেখব। আচ্ছা, তুমি কোনোদিন দেখেছ রাণী-মাকে?'

ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ বলিল, 'বাপ্‌রে! তাঁকে কি আর দেখবার জো আছে! কারও সাক্ষাতে তিনি বেরোন না।'

'তবে তুমি এসব জানলে কেমন করে' ?'

প্রকাশ বলিল, 'বাবু বলেন। বাবু আমায় বড্ডো ভালবাসেন কিনা! কোনো কথা আমার কাছে গোপন করেন্ না। কালকেই —হ্যাঁ কালই, তিনি আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'কি রে, কেমন বৌ হলো? দেখাবি না একদিন? দেখিস্ যেন ঝগড়া-ঝাঁটি করিসনে। তাঁর ধারণা ও-বৌএর সঙ্গে আমার ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল, তাই সে মরেছে।'

অপরাজিতা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'দেখতে যখন চেয়েছেন—দেখাবে নাকি?'

প্রকাশও হাসিল। বলিল, 'পাগল! ও এম্‌নি মুখেই বলেন। প্রথম যখন ওকে বিয়ে করে' এনেছিলাম, তখনও বলেছিলেন। কিন্তু হ্যাঁ, একটা কথা বলে' রাখি তোমায়, রাণী-মার পাল্‌কি এলে' তুমি যেন লোকের কথা শুনে' না যাওয়া হয়ো না। তোমার সে সতীনকেও অম্‌নি কে যেন কান-ভাঙ্গানী দিয়েছিল, তিন-তিনবার রাণী-মা ডেকে পাঠালেন, তা মেয়েটা এম্‌নি একগুঁয়ে ছিল, কত বললাম, কত বুঝালাম, কিছুতেই গেল না। শেষে লোক দিয়ে রাণী-মা একদিন তাকে একখানা বেনারসী শাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। শাড়ীখানা আছে এই বাক্সর ভেতর—দেখো। বাবু মনে-মনে কি যে ভেবেছিলেন কে জানে। একদিন আমায় বলেছিলেন বটে,— 'বলি হাঁরে প্রকাশ, রাণী-মা যে তোর বড় দুঃখু করছিল রে! বলছিল ছেলেমানুষ বৌ হয়ত ভেবেছে ও-বুড়ীর কাছে গিয়ে কি করব।' লজ্জায় আমার একেবারে মাথা হেঁট হয়ে গেল। হাসতে লাগলাম।

তা—তুমি ত' আর ছেলেমানুষ নও। তোমায় যেন কিছু বলতে না হয়।'

অপরাজিতা কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে-মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল।

প্রকাশের কথাই ঠিক!

পাঁচদিন পরে রাণী-মার পাল্‌কি আসিয়া হাজির!—অপরাজিতাকে যাইতে হইবে। রাণী-মা একবার দেখা করিতে চান।

অপরাজিতার কপাল ভাল।

অন্য মেয়েদের ডাকিবার সময় রাণী-মা শুধু একটা ঝিএর মুখে বলিয়া পাঠান। এবার কিন্তু ঝি ত' পাল্‌কির সঙ্গে আসিলই, তাহার সঙ্গে রাণী-মার এক চিঠি!

লিখিয়াছেন, 'প্রকাশকে বড় ভালবাসি মা, সে আমার ছেলের মত পাল্‌কি পাঠাইলাম। তুমি একবার আসিলে বড় সুখী হইব। আসিও। আসিতে অন্যমত করিও না। ইতি—'

প্রকাশ বাড়ী ছিল না। ফিরিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া খুশী যেন আর ধরে না। বলিল, 'কই দেখি রাণী-মার চিঠি!'

চিঠিখানা অপরাজিতার হাতেই ছিল। ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'দেখো।'

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়াটা প্রকাশের ভাল লাগিল না। তবু সে চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া একবার নাড়াচাড়া করিয়া কতক পড়িয়া কতক না পড়িয়া বলিল, 'পড়েছ ত?'

অপরাজিতা শুধু একবার ঘাড় নাড়িল।

প্রকাশ বলিল, 'যাও তাহ'লে, তোমার সেই ভালো শাড়ীখানি —সেই কল্‌কেতার মেয়েদের মত করে' পরে' যাও।'

অপরাজিতা গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিল।

মুখের অবস্থা তেমন সুবিধার নয়। প্রকাশ বলিল, 'চুপ করে' রইলে যে?'

অপরাজিতা তাহার স্বামীর কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, 'তুমি কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মীটি, আজ আমি যাব না।'

এমন কথা সে যে বলিতে পারে প্রকাশ তাহা ভাবে নাই। বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'সে কি! যাবে না কেন?'

অপরাজিতা বলিল, 'না। আমার মন চাচ্ছে না যেতে, জোর করে' যেতে আমি পারব না।'

প্রকাশ অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইল, কিন্তু অপরাজিতা বড় চতুর মেয়ে; বলিল, 'বলে' পাঠাও, আজ আমার শরীর ভাল নেই। যাব আর একদিন। নিজে থেকেই যাব।'

কিন্তু প্রকাশ ইহা ধীরে-সুস্থিরে গ্রহণ করিতে পারিল না। রাগে তখন সে ভিতরে ভিতরে ফুলিতেছিল, অথচ অপরাজিতাকে অপমান তিরস্কার করিতেও ভয় করে।

ভয় করিলেও চুপ করিয়া থাকিতে সে পারিল না। তাহার এই অবাধ্যতার জন্য অপরাজিতাকে যে-সব কথা সে বলিল তাহা ঠিক প্রকাশ্য তিরস্কার না হইলেও অপরাজিতা বুঝিল—স্বামী তাহার রীতিমত রাগ করিয়াছে।

পাল্‌কি ফিরিয়া গেল।

প্রকাশ এই বলিয়া ঝি ও বেহারাদের বিদায় করিল যে, স্ত্রীর শরীর তাহার আজ সত্যই অসুস্থ। আর-একদিন সে নিশ্চয়ই যাইবে। রাণী-মা যেন রাগ না করেন।

বলিয়াই সে অপরাজিতার কাছে আসিয়া মুখ ভার করিয়া ছি ছি করিতে লাগিল। বলিল, 'যতদিন না যাও ততদিন লজ্জায় আমি আর বাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারব না। না যাওয়াটা তোমার ভাল হলো না।'

কথায় কথা বাড়িবে বলিয়া অপরাজিতা তাহার একটি কথারও জবাব দিল না। চুপ করিয়া যেমন বসিয়াছিল তেমনি মুখ বুজিয়া বসিয়াই রহিল।

সারাদিন প্রকাশ আর অপরাজিতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলিল না। সন্ধ্যায় সে মুখ ভারি করিয়াই বাহির হইয়া গেল। বলিয়া গেল, আজ তাহাদের থিয়েটারের রিহার্শেল্ আছে, ফিরিতে রাত্রি হইবে।

অপরাজিতা কি আর করে। পুকুরে কাপড় কাচিয়া আসিয়া তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিতে গেল। কলিকাতা শহরের মেয়ে। শহরেই সে চিরকাল মানুষ। কিন্তু তাহার মা পল্লীগ্রামের। তাহার সেই

মাতার রক্তের ধারা বোধকরি এখনও তাহার দেহের মধ্যে একেবারে নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাহার মনের মধ্যে ছিল একটি প্রশান্ত নির্ম্মল অথচ তেজস্বিনী লক্ষ্মী প্রতিমার মতই নারীর একটি সুপবিত্র আদর্শ। বাল্যকালে মেয়েদের স্কুলে যখন সে পড়িতে যাইত, সবচেয়ে তাহার প্রিয় মনে হইত—রবিবারের দিনটি। সেদিন প্রভাতে স্নান করিয়া চওড়া লাল-পাড় শাড়ী পরিয়া পুষ্পপাত্রে ফুল-বেলপাতা চন্দন লইয়া অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে শিবপূজা এবং স্তোত্র-পাঠ করিতে হইত। চন্দন ও পুষ্পের গন্ধ-আমোদিত তাঁহাদের সে পূজা-কক্ষে যতক্ষণ সে চোখ বুজিয়া স্তোত্র আবৃত্তি করিত, মনে-মনে কল্পনা করিত—সে নিজে যেন তপশ্চারিণী তেজস্বিনী গৈরিক-বসনা গৌরী! আজও তাই তুলসীতলায় সন্ধ্যা-প্রদীপটি নামাইয়া গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিতে গিয়া তাহার সেই বাল্যের সুমধুর স্মৃতি-বিজড়িত সুন্দর দিনগুলির কথা মনে পড়িল। স্বামীরূপে যে সর্ব্বত্যাগী দেবাদিদেব মহাদেবকে সে কামনা করিত, আজ সে কামনা তাহার পূর্ণ হইয়াছে কিনা কে জানে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ী যে তাহার শহরে না হইয়া পল্লীগ্রামে হইয়াছে, ইহাও সে তাহার সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করে। মেয়েদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া সে পুকুরে স্নান করিতে যায়, কাঁকালে জলের কলসী লইয়া গল্প করিতে করিতে বাড়ী আসে, ভাত রাঁধিয়া শ্বশুরকে খাওয়ায়, স্বামীকে খাইতে দেয়, বুড়ী পিসিমার সঙ্গে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতে করিতে নিজে খায়, ঘাটে বাসন মাজিয়া আনে।—এ যেন তাহার কত কালের পাতানো সংসার। বড় ভাল লাগে।

১৪০

কিন্তু হঠাৎ এই জমিদার-গৃহিনীর আমন্ত্রণে আজ আর তাহার কিছুই যেন ভাল লাগিতেছিল না। বারে-বারে কাঁটার মত সেই কথাটাই তাহার বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছিল। স্বামীর কথাবার্ত্তায় যতটুকু সে বুঝিয়াছে, তাহাতে ব্যাপারটা তাহার কাছে সন্দেহ-জনক মনে হইয়াছে বলিয়াই সে যায় নাই। স্বামী তাহার উপর রাগ করিয়াছে। করুক্ রাগ! নিনন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করার চেয়ে না যাওয়া ঢের ভালো।

অপরাজিতা তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করিল, সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল এবং বিঘ্ন হইতে ভগবান যেন তাহাকে রক্ষা করেন! সে নিষ্পাপ, সে নিষ্কলুষ, হে বিঘ্ননাশন মধুসূদন, হে ত্রিপুরারি মহেশ্বর, কলঙ্ক যেন তাহাকে স্পর্শ না করে!

শ্বশুরের শরীর তেমন সুস্থ নয়। সন্ধ্যার পরেই তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিয়া বিছানা পাতিয়া পিসিমাকে জলখাবার দিয়া অপরাজিতার হাতে কোনও কাজ ছিল না। স্বামীর আসিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া গেছেন। ধীরে-ধীরে লণ্ঠন হাতে লইয়া সে উপরে উঠিয়া গিয়া সতীনের বাক্সটা খুলিয়া বসিল। কি তাহার ছিল না ছিল দেখিবার ইচ্ছা হইল। আহা বেচারা, স্বামীর ঘর করিবার কত সাধই না তাহার মনে ছিল! কিন্তু কোনও সাধই তাহার পূর্ণ হয় নাই। দু'দিন ঘর করিতে না করিতেই অভিমানিনী হয়ত বড় দুঃখেই

চলিয়া গেছে। কাহাকেও কিছু সে বুঝিতে দিল না,—আশ্চর্য্য !

ডালি-দেওয়া বাক্স। মাঝখানে কয়েকখানি খাম, চিঠির কাগজ, একশিশি আলতা, আলতা ঢালিবার ছোট একটু এলুমেনিয়ামের বাটি, চুলের গোড়া-আঁটা কালোরঙের খানিকটা ফিতা, গাটাপার্চ্চার ছ'টি পিন, দুটি ক্লিপ ! পাশের ছোট ছোট খোপগুলির ভিতর ছোট-খাটো নানান্ জিনিস,—দিব্যি পরিপাটিভাবে সাজানো। উপরের ডালিটি তুলিতেই দেখা গেল, নীচে শুধু তাহার কাপড়-জামা ছাড়া আর কিছু নাই। কীই-বা থাকিবে ! আহা ছেলেমানুষ, এ-ই যে সে যত্ন করিয়া রাখিয়াছে এই যথেষ্ট। ভাল কাপড়ের মধ্যে একখানি জামদানী, আর একখানি বেনারসী। এই বেনারসী শাড়ীখানিই বোধকরি তাহাদের রাণী-মার দেওয়া। কাপড়টি সে যত্ন করিয়া একটি খবরের কাগজ দিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে।

অপরাজিতা ডালিখানি আবার তেম্নি করিয়া ঢাকা দিয়া ছোট-ছোট জিনিসগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। রূপার একটি সিঁদুরের কৌটা। কৌটাটি তাহাকে কে দিয়াছে কে জানে। অপরাজিতা কৌটাটি খুলিয়া আঙ্গুলের ডগায় সিঁদুর লইয়া নিজের সিঁথিতে পরিল।—তোমারই মত আমিও যেন এই সিঁদুর মাথায় লইয়া যাইতে পারি বোন্ !

কাগজের একটি সাবানের বাক্স। তিনখানি সাবানের মধ্যে একখানি মাত্র তাহার খরচ হইয়াছে, বাকি দুইখানি এখনও তেম্নি কাগজ-মোড়া। তাহারই ভিতর লাল পাথরের একটি নাকছবি, আর একটি ফাঁকা হোমিওপ্যাথী ঔষধের শিশি।

ডানদিকের কোণে জার্ম্মান-সিলভারের চক্‌চকে একটি পানের ডিবে। ডিবেটি খুলিতেই দেখিল, ভাঁজ-করা একটি চিঠির কাগজ। পেন্সিল দিয়া কাগজে কি যেন লেখা। কাগজ খানি খুলিয়া অপরাজিতা পড়িতে বসিল। ছেলেমানুষের মত হাতের অক্ষর। তাড়াতাড়ি লিখিতে গিয়া মাঝে-মাঝে দু'একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছে। বানান ভুল।—তা হোক্, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত লেখাটি আগাগোড়া ভাল করিয়া পড়িয়া অপরাজিতা অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হাত-পা তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

বুঝিতে তাহার আর কিছু বাকি রহিল না। লেখাটি তাহার সতীনের। মরিবার আগে সে নিজের হাতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে—

—আমি মরিব। আমার আর বেঁচে কোন শুক নাই। এ গাঁয়ের জমীদার আমার সর্ব্বনাশ করেছে। মুখে কাপড় চাপা দিয়া থিয়েটারের জায়গা থেকে দু'জন লোক আমায় তুলে নিয়ে গেল। তাহার পর—আর আমি লিখিতে পারছি না। এর পিতিকার তুমি করিও। না পার ভগমান করিবেন। তুমি কিছু মনে করিও না। আবার বিয়ে করিয়া শুকী হইও। আমার মা নাই, বাবা নাই, দুঃখু করিবার এক তুমি ছাড়া আর কেউ নাই।

তোমাকে ছেড়ে যাইতে আমার মন নাই। বড় দুঃখে ছাড়িয়া চলিলাম। মনে করিও, আমি ছিলাম না। আর বেশী লিখতে পারছি না। কান্নায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।—

অপরাজিতার চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল। ভগবান তাহাকে আজ রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু হায়রে অভাগী, অত্যাচারীর ক্ষুধার আগুনে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিলি! এর চেয়ে দুঃখের—এর চেয়ে পরিতাপের আর কি থাকিতে পারে!

তাহার মনে হইতে লাগিল, এ-গ্রামে পুরুষ যাঁহারা আছেন তাঁহারা পুরুষ-নামের যোগ্য কেহই নন, পৌরুষ কাহারও নাই। নারীকে যাহারা রক্ষা করিতে পারে না, অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত যাহাদের নাই—বৃথাই তাহাদের জন্ম।

অপরাজিতার মনে হইল, সে যদি পুরুষ হইত, এই মুহূর্ত্তে সে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গিয়া দাঁড়াইত।

কিন্তু না, না-ই বা হইল সে পুরুষ, নারীর বেদনা পুরুষে বুঝিবে না, এ অত্যাচারের প্রতিকার নারীকেই করিতে হইবে। যে মর্ম্মান্তিক বেদনায় এই নিতান্ত অসহায়া দুর্ব্বলা নারী প্রাণত্যাগ করিয়াছে সে বেদনার গুরুত্ব একমাত্র নারী ছাড়া বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই।

অপরাজিতা মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিল, কাহারও সাহায্য সে চাহিবে না, কাহারও কাছে এ-কথা সে প্রকাশ করিবে না, হয় সে নিজেই ইহার প্রতিবিধান করিবে, নয় ত' তাহার অগ্রবর্ত্তিনীর মত নিজেরও জীবন বিসর্জ্জন দিবে। এমন করিয়া বাঁচিয়া থাকায় লাভ নাই।

অপরাজিতা কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় যাইতে চাহিল।

প্রকাশ বলিল, 'কেন বল দেখি ? হঠাৎ ?'

অপরাজিতা বলিল, 'আছে কাজ, তুমিও সঙ্গে চল। তিনচার দিনের মধ্যেই ফিরে' আসব।'

'আমি ?' বলিয়া প্রকাশ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিল। কলিকাতায় তখন নাট্যমন্দিরে 'ষোড়শী'র জয়-জয়কার ! শিশিরকুমার নাকি অপূর্ব্ব অভিনয় করিতেছেন। প্রকাশের একটিবার দেখিবার ইচ্ছা। বংশলোচনবাবু নিজে সেদিন দেখিয়া আসিয়াছেন। এবং দেখিয়া আসিয়া অবধি তাঁহারও মনে জীবানন্দ সাজিবার সাধ জাগিয়াছে। বলিতেছিলেন, জমিদারের অভিনয় জমিদার নিজে যদি করে ত' তাহা ভালো না হইয়া পারে না।

প্রকাশকে নাকি প্রফুল্লর পার্ট লইতে হইবে। সুতরাং একটিবার এই সুযোগে দেখিয়া আসা তাহার উচিত।

প্রকাশ বলিল, 'চল তবে বেড়িয়েই আসি।'

তিন দিন পরে তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে কলিকাতা রওনা হইল।

কলিকাতায় ছিল তাহারা সাত দিন।

এই সাতদিনের মধ্যে প্রকাশ উঠাউঠি দুদিন 'ষোড়শী'র অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছে। অপরাজিতাকে একদিন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল।

কলিকাতায় গিয়া অবধি অপরাজিতা প্রতিদিন তাহার সহপাঠি এবং প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অশ্বস্তিকর ভাব। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে থামিয়া থামিয়া জবাব দেয়। সদাসর্ব্বদাই কিসের যেন চিন্তায় বিভোর।

রতনপুরে ফিরিয়া প্রকাশ বলিল, 'কল্‌কাতায় ত' তোমার সঙ্গে ভাল করে' কথা বলবার অবসরই পাই নি। এসো দুটো কথা কই।'

মৃদু হাসিয়া অপরাজিতা বলিল, 'এসো।'

প্রকাশ তাহার কাছে গিয়া বসিল।

অপরাজিতাই প্রথম কথা বলিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'ষোড়শী'র অভিনয় করবে তাহ'লে ?'

ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ বলিল, 'না, বোধ হয় হবে না।'

'কেন ?'

প্রকাশ বলিল, 'অলকার পার্ট নেবার মত লোক পাচ্ছি না।'

বলিয়াই হাসিতে হাসিতে অপরাজিতাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'তুমি যদি কর ত' হয়। চমৎকার মানাবে কিন্তু।'

মুখ টিপিয়া হাসিয়া অপরাজিতা বলিল, 'মুখে আগুন !'

বলিল, 'হ্যাঁ পারি করতে। অলকার কাছে জীবানন্দ যখন মর্ফিয়া চাইবে, সেই মর্ফিয়া যদি সত্যিকারের বিষ হয়, আর আমার যতখানা খুশী ততখানা যদি তোমাদের ওই জমিদারবাবুকে দিতে পারি খাইয়ে।'

এই বলিয়া সে তাহার স্বামীর মুখের পানে সহাস্যমুখে তাকাইয়া রহিল।

প্রকাশ বলিল, 'আচ্ছা বল ত' অলকা—'

'আমি বুঝি তোমার 'অলকা' হই ?'

প্রকাশ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'শিশিরবাবুর অভিনয় আমার এত ভাল লেগেছে যে, কিছুতেই তা ভুলতে পারছি না। চব্বিশ ঘণ্টা মনে হচ্ছে আমিই যেন জীবানন্দ। তাই তোমায় অলকা বলে' ফেললাম।'

অপরাজিতা হাসিয়া বলিল, 'তুমি জীবানন্দ ? জীবানন্দের পদধুলির যোগ্য হ'তে পারলে ধন্য মনে কোরো।'

প্রকাশ বলিল, 'মাইরি আর-কি! মাতাল ব্যাটা জোচ্চোর, পাজি।'

অপরাজিতা না পারিল হাসিতে, না পারিল কোনও কথা বলিতে, চুপ করিয়া হেঁটমুখে কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, 'কই তোমার রাণী-মা যে আর আমায় ডেকে পাঠালেন না?'

এ কথা যে অপরাজিতা আবার কোনোদিন বলিবে প্রকাশ তাহা ভাবে নাই। খুশী হইয়া বলিল, 'যাবে? তুমি যাবে?'

অপরাজিতা বলিল, হ্যাঁ যাব।'

আনন্দে প্রকাশ একেবারে যেন লাফাইয়া উঠিল।—'তা এর আগে বললেই ত' হ'তো! বাবু আমায় কতদিন যে বলেছেন তার ঠিক নেই। কথাটাকে আমিই শুধু এড়িয়ে গেছি। ভাল কথা, কালই বলব আমি বাবুকে।'

'বোলো।' বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অপরাজিতা চুপ করিয়া আবার কি যেন ভাবিতে লাগিল।

পরদিন সকালেই প্রকাশ তাহার স্ত্রীর অভিমত বাবুকে জানাইল। হ্যা হ্যা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'রাণী-মা ভেবেছেন বৌএর হয়ত' বড্ডো দেমাগ্, তাই বুঝি এলো না। তখন অসুখ করেছিল কি না! আমি নিজে দেখেছি—গা একেবারে আগুনের মত গরম। এখন আমায় রোজ তাগাদা দিচ্ছে।

রোজ বলছে, ছি ছি রাণী-মা কি ভাবছেন কে জানে! দেবেন আজ একবার পাল্‌কিটা পাঠিয়ে।—যাবে।'

বৈকালে রসিক অধিকারীর দরজায় পাল্‌কি আসিয়া দাঁড়াইল।

অপরাজিতা সাজসজ্জা কিছুই করিল না, লাল-পাড় সাদাসিদা একখানি শাড়ী পরিয়া, আঁট-সাঁট জামা একখানি গায়ে দিয়া প্রথমে তাহার স্বামীকে একটি প্রণাম করিল, প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ফিরে যদি আর না আসি ত' মনে কিছু কোরো না।'

কথাটা প্রকাশের কাছে হেঁয়ালির মত মনে হইল। বলিল, 'সে আবার কি-কথা?' বলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইতে গিয়া দেখে, চোখে জল!

প্রকাশ ত' অবাক্!

জিজ্ঞাসা করিল, 'কাঁদছ যে? না বাপু, এমন করে' তোমায় কে যেতে বল্‌লে?'

চোখের জল মুছিয়া অপরাজিতা বলিল, 'না কাঁদিনি। নূতন জায়গা যাচ্ছি, তাই বড় ভয় করে।'

'ভয় কি! ছি!'

অপরাজিতা হেঁট্ হইয়া আবার তাহার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, 'যাক্, তুমি অভয় দিয়েছ, তবে আর ভয় নেই।'

ব্যাপারটা প্রকাশের কাছে সম্পূর্ণ নূতন। অবাক হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। সাদা শাড়ীর বদলে বেনারসী কিম্বা একটা ভালো রঙিন শাড়ী তাগকে

পরিয়া যাইতে বলিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু তাহাও আর তাহার বলা হইল না।

নীচে নামিয়া গিয়া শ্বশুর ও পিসিমাকে প্রণাম করিয়া অপরাজিতা মনে-মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে পাল্‌কিতে গিয়া চড়িয়া বসিল।

আধ-আলো আধ-অন্ধকার প্রকাণ্ড একটা চত্বরের পাশে পাল্‌কি নামানো হইল। পাল্‌কির সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে ঝি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দরজা খুলিয়া ঝি বলিল, 'নেমে এসো মা, এই যে, এই পথে।'

খুব সাহসে ভর দিয়া পাল্‌কি হইতে অপরাজিতা নামিল বটে, কিন্তু তাহার বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। বলিল, 'চল।'

বলিয়া সে ঝিএর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল। সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া একটা বারান্দা পার হইয়া ছোট একটি ঘরের সুমুখে দাঁড়াইয়া ঝি বলিল, 'এই ঘরের ভেতর দিয়ে অন্দরে যাবার পথ। চল।' বলিয়া অপরাজিতাকে আগে ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া ঝি একটুখানি থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।

হঠাৎ পশ্চাতে হড়াম্ করিয়া শব্দ হইতেই অপরাজিতা তাকাইয়া দেখে, বাহির হইতে দরজাটা ঝি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। টানিয়া দেখিল, সত্যই তাই। অন্য সময় হইলে অপরাজিতা হাসিত।

কিন্তু আজ এই বিপদের মুহূর্ত্তে সব জানিয়া শুনিয়াও তাহার হাসি পাইল না।

চুপ করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কি যেন সে ভাবিল। ওদিকের আর-একটা দরজা খোলা রহিয়াছে। অপরাজিতা মনে করিল ওই দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু এদিকের দরজা যখন বন্ধ হইয়াছে, ও-দরজা দিয়া বাহির হওয়াও যে সহজ হইবে না তাহা সে জানিত। জানিয়াও সে অগ্রসর হইল। সুমুখে একটা পালঙ্ক। পালঙ্কটা পার হইতেই দেখিল, তাহারই পাশে দরজার ঠিক সুমুখে একটি আরাম-কেদারার উপর পা ছড়াইয়া শুইয়া আছেন—বংশলোচন বাবু স্বয়ং।

অপরাজিতাকে দেখিয়াই বাবু ভাল করিয়া উঠিয়া বসিলেন। একাগ্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'বাঃ! চমৎকার।'

অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিল, 'কে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন? আপনি, না আপনার স্ত্রী?'

এ প্রশ্নের জবাব দিবার জন্য বংশলোচনবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'কেন বল দেখি? আমিই যদি ডেকে পাঠিয়ে থাকি—তাহ'লেই-বা......তাহ'লে,...সুন্দরী—তোমার মত...তোমার যা চাই, যে-জিনিসের অভাব—যখন যা বলবে...'

বলিতে বলিতে হাত বাড়াইয়া তিনি অপরাজিতাকে ধরিতে গেলেন।

অপরাজিতা তৎক্ষণাৎ পিছু হঠিয়া গিয়া বলিল, 'খবরদার!'

এরূপ প্রত্যাখ্যান কোনও নারীর কাছে বংশলোচনবাবু শুনিয়াছিলেন কিনা কে জানে। আরও একটুখানি আগাইয়া গিয়া আবার হাত বাড়াইয়া বলিলেন. 'রাগ কোরো না লক্ষীটি, এসো, এতে দোষ কি ! কেন, প্রকাশের চেয়ে কি আমি মন্দ ?'

অপরাজিতা বলিল, 'ছি ছি লজ্জা নেই আপনার ? ছি ! আপনি না জমিদার ! আপনি না সবার মাথার ওপর ! আপনার জন্যে আমার সতীন আত্মহত্যা করেছে, আপনার জন্যে এ-গ্রামে কত মেয়ে যে কেঁদে কেঁদে দিন কাটাচ্ছে, কত মেয়ের কত অভিশাপ কুড়োচ্ছেন আপনি—তা জানেন ? ছি !'

বংশলোচনবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'বাঃ, কলকাতার মেয়ে নইলে কি এত কথা বলতে পারে কখনও ? চমৎকার ! এই যে তুমি আমায় তিরস্কার করলে, এ-ও আমার কত ভাল লাগছে। এসো, যথেষ্ট হয়েছে, এসো !' বলিয়া জোর করিয়া তিনি তাহার বাঁহাত খানা চাপিয়া ধরিলেন।

এবার আর অপরাজিতার সহ্য হইল না। ঝাঁকানি দিয়া হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া কাপড়ের তলা হইতে কোমরে-বাঁধা চক্‌চকে' ছোরাটা টানিয়া বাহির করিয়াই সোজা একেবারে বংশলোচনবাবুর হাতের উপর বসাইয়া দিয়া বলিল, 'তোমায় আমি খুন করতে এসেছি, তা জানো ? তোমার মত মানুষ দুনিয়া থেকে যত লোপ্ পায় ততই ভালো।'

হাত দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। বংশলোচন বাবু হাতের উপর হাত চাপা দিয়া একেবারে অবাক হইয়া গিয়া,

একবার তাঁহার হাতের দিকে একবার অপরাজিতার মুখের দিকে ঘন ঘন তাকাইতেছিলেন। বলিলেন, 'বটে! এত সাহস!' বলিয়াই তিনি তাঁহার আহত হাত লইয়াই ছোরাটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইতে গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পিছু হঠিয়া আসিলেন।

অপরাজিতা হাত তুলিয়া ছোরাখানা এবার সত্য সত্যই তাঁহার বুকের উপর বসাইতে যাইতেছিল, বংশলোচনবাবু প্রাণভয়ে ছুটিয়া পালঙ্কের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'থাক্, তুমি বাড়ী যাও, এ-কথা কাউকে বোলো না যেন।'

অপরাজিতা বলিল, 'একটি কথা আছে আপনার সঙ্গে। বলুন যে আর জীবনে কখনও কোনও মেয়ের সর্ব্বনাশ করবেন না। এই বলে' যদি প্রতিজ্ঞা করেন ত' ভালই, আমি চলে যাচ্ছি, কাউকে কিছু বলব না। আর তা না হয় ত' হয় আজ আপনাকে মরতে হবে—নয় আমাকে।'

বংশলোচনবাবু ক্ষতস্থানটা চাপা দিয়া বলিলেন, 'করলাম প্রতিজ্ঞা। উঃ, তুমি যাও। তুমি যাও! বাইরে পাল্‌কি আছে। আমি লোক ডেকে দিচ্ছি।'

অপরাজিতা বলিল, 'যাচ্ছি, কিন্তু মনে রাখবেন—এই শেষ নয়। মৃত্যুর জন্য একা আমি প্রস্তুত হইনি, আপনার এ অমানুষিক অত্যাচার এ-গ্রামের কোনও মেয়েই আর সহ্য করবে না। হয় মরবে, নয় মারবে। মনে থাকে যেন।'

বলিয়া অপরাজিতা দরজার খিল খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

দিন দুই-তিন বংশলোচনবাবুর আর দেখা নাই।

বাড়ী হইতে একদণ্ডের জন্যও তিনি বাহির হন না। লোক আসিলে বলেন, 'অসুস্থ।'

ওদিকে অপরাজিতাকে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন দেখলে? রাণী-মা কেমন?'

অপরাজিতা হাসিয়া বলে, 'বেশ।'

'হাসছ যে?'

অপরাজিতা বলে, 'হাসতেও পাব না?'

প্রকাশ বলিল, 'না, তা কেন পাবে না? জিজ্ঞেস্ করছিলাম— কেমন্ মানুষ, কি বললেন, কি দিলেন...'

'বেশ মানুষ, খুব ভাল মানুষ।' বলিয়া অপরাজিতা কথাটা তাহার পাল্‌টাইয়া লইল। বলিল, 'আজ ক'দিন যে থিয়েটারে যাও নি?'

প্রকাশ বলিল, 'বাবু আজ ক'দিন বেরোন নি বাড়ী থেকে। অসুখ করেছে।'

কি অসুখ অপরাজিতা তাহা জানে। মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবুর ছেলের নাম কি গা?'

প্রকাশ বলিল, 'শ্যামসুন্দর।'

অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিল, 'কত বড়? কি করে? বিয়ে হয়েছে?'

প্রকাশ বলিল, 'আমাদের চেয়ে বড়। বিয়ে হয়েছে বই-কি! ছেলে হচ্ছে না বলে' বাবু মাঝে মাঝে বড় দুঃখু করেন।'

'ছেলে' বলিয়া অপরাজিতা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, 'আচ্ছা, বাপে-ছেলেতে ভাব কেমন ?'

প্রকাশ বলিল, 'ভাব তেমন নেই।'

ভাব সত্যিই ছিল না।

হাজার হোক, ছেলে বড় এবং বাপের কীর্ত্তিকলাপ সবই বুঝিতে পারে।

বুঝিতে পারে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না।

কাহারও সঙ্গে কথা নাই বার্ত্তা নাই, চুপচাপ ঘুরিয়া বেড়ায়, হর্ষ ময়রার গোল্‌দারী দোকানের চালায় একটা চট্ পাতিয়া কড়ি-বাঁধা হুকা-কলিকায় তামাক টানে। লোকে বলে, 'হিরণ্যকশ্যপের ছেলে প্রহ্লাদ।'

বাপ বলেন, 'ছেলেটার কিছু হলো না।'

ছেলে বলে, 'ও বাপের নাম আর কোরো না আমার কাছে।'

স্ত্রীকে সাবধান করিয়া দেয়; বলে, 'বাবা যখন একা থাকবেন, তুমি যেন যেয়ো না তাঁর কাছে।'

রুগ্না স্ত্রী তাহার ম্লান একটুখানি হাসিয়া নিজের দেহের পানে হেঁট মুখে তাকায়। ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'বেশ।'

ছায়াছবি

বংশলোচনবাবুর হাতের ঘা সারিয়াছে। বলেন, 'দেওয়াল থেকে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ছবি গেল পড়ে'। হাতের ওপর তারই খানিক্‌টা কাঁচ—' বলিয়া একবার হাতের দিকে একবার শ্রোতার মুখের পানে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকান।

থিয়েটারের পার্টিতে তাহার আর তেমন মন নাই। ছেলে ছোক্‌রার দল নিজেরাই প্রতিদিন আখ্‌ড়া-ঘরে গিয়া আড্ডা মারে। কোনোদিন বা মহলা দেয়, কোনোদিন বা তাস পিটায়। বাবুর অবর্ত্তমানে কাজকর্ম্ম ভাল করিয়া চলে না।

একদিন দুপুরে তাহারা জোট পাকাইয়া কাছারি-বাড়ীতে বংশলোচনবাবুকে ধরিয়া বসিল। বাবুকে দেখিয়াই ত' তাহারা অবাক্! পাঞ্জাবী শিখের মত চেহারা—এই ক'দিনেই শুকাইয়া যেন একেবারে দড়ি হইয়া গেছে। কপালে চন্দনের তিলক-ফোঁটা, পরনে পট্টবস্ত্র, গলায় তুলসীর মালা। বলেন, 'তোরা আবার কি জন্যে এলি বাপু?'

ছোক্‌রারা বলে, 'দেখুন, আপনি না গেলে ত' আর আমাদের থিয়েটার চলে না।'

বংশলোচনবাবু ধীরে ধীরে বলেন, 'আমায় তোরা রেহাই দে বাবা। থিয়েটারটা পারিস ত' তোরাই চালা, আমি এবার হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করব।'

'হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন! বলেন কি?'

বাবু হাসিয়া বলেন, 'হাঁরে আর কি আমার থিয়েটার করবার সময় আছে? আমার যে বয়েস হলো অনেক। পারিস ত' শ্যামসুন্দরকে নিগে তোদের সঙ্গে। আমি টাকা দেব।'

তাহাই হইল।

বাবু হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মন দিলেন।

মাসখানেক পরে দেখা গেল, বাবুর মাথায় এক লম্বা টিকি, পায়ে খড়ম, গায়ে নামাবলী, গলায় তুলসীর মালা!

কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ 'হরিবোল' 'হরিবোল' করিয়া ওঠেন।

বড় বড় গোঁফ ছিল বলিয়া এতদিন বুঝিতে পারা যায় নাই, গোঁফ জোড়াটা এখন তিনি কামাইয়া ফেলিয়াছেন, দেখা গেল, চোয়াল তাঁহার বসিয়া গেছে,—মুখে বার্দ্ধক্যের রেখা!

আগে তিনি খুব ঘটা করিয়া শ্যামা পূজা করিতেন। নিজের বাড়ীতে পূজা ছিল না বলিয়া গ্রামের হাট-তলায় চাঁদা করিয়া বারোয়ারী শ্যামা পূজা হইত। তিন চার দিন ধরিয়া মদ্য-মাংস, নাচ-গান, আমোদ-আহ্লাদের বাকি কিছুই থাকিত না। হঠাৎ সে বৎসর ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী তিথিতে বংশলোচনবাবু প্রচুর আয়োজন করিয়া শ্রীশ্রীভগবান বাসুদেবের পূজা করিলেন।

ছোক্‌রাদের বলিলেন, 'তোরা বাবা ও-সব ষোড়শী-টোড়শী ছাড়্, জন্মাষ্টমীর রিহার্শ্যাল্ দে।'

ছোক্‌রারা পরম উৎসাহে জন্মাষ্টমী অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিল।

কিন্তু দিন তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে।

বসিয়া বসিয়া ভাল করিয়া জন্মাষ্টমীর অভিনয় দেখা বংশলোচন বাবুর ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠিল না।

হঠাৎ তিনি জ্বরে পড়িলেন।

ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল, ভাল ভাল ঔষধ দেওয়া হইল, সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটি কিছুই হইল না।—

জ্বর তাঁহার তাহাতেই সারিল, কিন্তু সহসা একদিন সন্ধ্যায় তিনি অনুভব করিলেন, পা দুইটা যেন তাঁহার অবশ হইয়া গেছে, নড়াইতে চাহিলে নড়াইতে পারেন না, চিম্‌টি কাটিলে লাগে না,—একেবারে নিসাড়, নিস্পন্দ,—পঙ্গু।

কেন যে এমন হইল কিছুই তিনি বুঝিলেন না। শেষ বয়সে এম্‌নি করিয়া শয্যাশায়ী অবস্থায় পরের একটুখানি অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া দিনের পর দিন তাঁহাকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে ভাবিয়া—চক্ষে তাঁহার জল আসিল।

লোকে বলিতে লাগিল, হওয়াই স্বাভাবিক। অত্যাচারীকে দমন করিবার কৌশল একমাত্র ভগবানই জানেন।

তাহাদের ব্যাকুল প্রার্থনা একমাত্র ভগবান স্বকর্ণে শুনিয়াছেন।

শুইয়া শুইয়া বংশলোচনবাবু দিবারাত্রি ভাবিতে লাগিলেন।

ভাবিতে লাগিলেন, শ্যামসুন্দরের একটা ছেলে হইল না, কত লোক 'নির্ব্বংশ হও' বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছে,—তাহাই কি তবে ফলিল নাকি? আর এমন করিয়া নিশ্চল নির্জ্জীব জড় পদার্থের মত পড়িয়া পড়িয়া তিলে তিলে নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে অগ্রসর হওয়াও ত' বাঞ্ছনীয় নয়!

বংশলোচনবাবু ভাবিলেন, এম্‌নি করিয়া বেশিদিন যদি তাঁহাকে ভুগিতে হয় ত' তিনি আত্মহত্যা করিবেন।

আত্মহত্যা করিবার কথাটা মনে হইতেই হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল প্রকাশের সেই প্রথমা পত্নীর কথা। মেয়েটা তাহারই অত্যাচারে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে। সর্ব্বনাশ! এ কি তাহারই অভিসম্পাৎ?

দিবারাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়া নিজের কৃতকর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া বংশলোচনবাবুর অবস্থা হইল ঠিক পাগলের মত।

শ্যামসুন্দরকে কাছে ডাকিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। জমিজমা বিষয়-সম্পত্তির কথা এতদিন তিনি শ্যামসুন্দরকে বড় একটা বলেন নাই, এইবার কাছে ডাকিয়া আদর করিয়া বলিলেন, —'অনেক কিছু নষ্ট করেছি, নষ্ট করেছি নিজের হাতে। এখনও

যা আছে, তা' যদি রেখে-ঢেকে' খেতে পার ত' তোমার যথেষ্টই আছে।'

শ্যামসুন্দর হেঁটমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বংশলোচনবাবু তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'আমি আর বাঁচব না শ্যামসুন্দর, বিষয় সম্পত্তি ভাল করে' দেখাশোনা করিস্ বাবা! কিন্তু—'

বলিয়া একটুখানি থামিয়া বলিলেন, 'বৌমার একটি ছেলে দেখে' যেতে পারলাম না, এই বড় দুঃখু রইল বাবা!'

রাণী-মা পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন। কাছে আসিয়া বলিলেন, 'বৌমা পোয়াতি।'

বংশলোচনবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন।—'এ্যাঁ, সত্যি? সত্যি? কই, এতদিন বলনি যে? একদিনও ত' শুনিনি এ কথা!'

রাণী-মা বলিলেন, 'সবে এই আজই বুঝতে পারলাম। বৌমা লুকোচ্ছিল।'

'কিন্তু হ্যাঁগা—!' বলিয়া বংশলোচনবাবু তাঁহার স্ত্রীর মুখের পানে তাকাইলেন। কথা বলিতে গিয়া চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল। বলিলেন, 'দেখ্তে পাব?'

বংশলোচনবাবু চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

এতদিন পরে বৌমার ছেলে হইবে, বংশে তাঁহার ওই একটিমাত্র ছেলে শ্যামসুন্দর, তাহারই ছেলে, ইহার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে! বংশলোচনবাবু বলিলেন, 'ডাকো আমার বৌ-মাকে। ডাকো!'

রাণী-মা বৌমাকে ডাকিলেন।

শীর্ণা গৌরাঙ্গী তরুণী বধূ—কঙ্কাবতী হেঁটমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বংশলোচনবাবু বলিলেন, 'বৌমা আমার বড় রোগা হয়ে গেছে, না? বসো মা বসো তুমি আমার শ্যামসুন্দরের কাছে, আমি দেখি!'

কঙ্কাবতীর লজ্জা করিতেছিল, রাণী-মা হাতে ধরিয়া বসাইয়া দিলেন।—'লজ্জা কি মা, বোসো, শ্বশুর তোমার দেখ্‌তে চাচ্ছেন—বোসো।'

তাহার পর শ্বশুরের কথা যেন আর ফুরাইতে চায় না।

এমন ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন, মনে হইল যেন তিনি আর বাঁচিবেন না বলিয়াই তাঁহার যাহা-কিছু গোপন, যাহা কিছু বলিবার—সবই আজ পুত্র এবং পুত্রবধূর সুমুখে বলিয়া যাইতেছেন।

রাণী-মাই শেষে তাঁহাকে চুপ করাইয়া দিলেন।

কিন্তু মরা-বাঁচার কথা কে বলিতে পারে!

বংশলোচনবাবু মরিলেন না।

মাসের পর মাস তেমনি পঙ্গু অবস্থায় শয্যাশায়ী হইয়া তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। সেবা শুশ্রূষা ঔষধপত্র সবই চলিতে লাগিল।

ছায়াছবি

বিষয় সম্পত্তির আদায় অনাদায় সবই এখন শ্যামসুন্দরের হাতে। শ্যামসুন্দর দেখিল, জমিদারীর আয় অত্যন্ত কম। এত কম যে দশ বৎসর পরে খরচ যদি তাহাদের বাড়ে ত' তাহারা খাইতে পাইবে কিনা সন্দেহ। পিতা তাহার বহু সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছেন।

শ্যামসুন্দর সেদিন কাছারিতে বসিয়া গোমস্তাকে কি যেন বলিতেছে, এমন সময় ঘোম্‌টা টানিয়া দরজার কাছে একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্যামসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, 'কি চাই আপনার?'

মেয়েটি ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া বলিল, 'বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করব।'

বাবুর সঙ্গে দেখা আজকাল সহজে কেহ করিতে পায় না, শ্যামসুন্দর নিজেই তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বলিল, 'বাবুর ভারি অসুখ, দেখা এখন হবে না। আপনার কি চাই বলুন, কি দরকার!'

মেয়েটি ঠিক যুবতীও নয়, প্রৌঢ়াও নয়, বলিল, 'তুমি কি তাঁর ছেলে?'

শ্যামসুন্দরকে বলিতে হইল না, যে কর্ম্মচারী কাছে বসিয়াছিল সে-ই বলিল, 'হ্যাঁ, ইনিই বাবুর ছেলে কি বলতে চাও বল—এঁর কাছে বললেই হবে।'

মেয়েটি ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'না, ছেলের কাছে বল্‌তে আমি পারব না। আমার নাম করে' বাবুকে গিয়ে বলুন

তাহ'লেই বুঝবেন তিনি। আমার নাম কামিনী। বলুন—অম্বিকানগরে বাড়ী।'

শ্যামসুন্দর একটুখানি বিপদে পড়িল। আন্দাজি বুঝিতে যে খানিক্‌টা পারে নাই তাহা নয়, তবু সে ইহাকে কি বলিয়া যে বিদায় করিবে ভাবিয়া পাইল না। একটুখানি ভাবিয়া বলিল, 'বাবুর অসুখ বড় বেশি, কারও সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া ডাক্তারের নিষেধ। পাঁচটা টাকা আপনি নিয়ে-যান। আমি বুঝেছি।'

'বুঝেছ যখন—তখন বলি।' বলিয়া অম্বিকানগরের কামিনী মাথার ঘোমটা তাহার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া সেইখানেই চাপিয়া বসিল। বলিল, 'পাঁচ টাকা নয়। মাসে পঁচিশ টাকা করে' আদালতে আমি ডিক্রি পেয়েছি। আজ চারমাস আমার টাকা বাকি। বলি, আবার কি আদালতে আমায় যেতে হবে না ভালয়-ভালয় দেবে ?'

শ্যামসুন্দর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আদালতের কাগজপত্র কিছু আছে আপনার কাছে ?'

কামিনী বলিল, 'অত সব জানি না বাছা, তুমি তাকে জিজ্ঞেস করে' এসো।'

শ্যামসুন্দর নিজে না গিয়া কর্ম্মচারীকে তাহার পিতার কাছে পাঠাইল। বলিল, 'যাও ত' বিনোদ, জেনে এসো।'

আর একবার মেয়েটির নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া বাবুর কাছে বিনোদ জানিতে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, সত্যি।'

কামিনী রাগিয়া উঠিল।—'সত্যি নয় ত' কি আমি মিছে কথা বল্‌তে এসেছি নাকি ? আ-মর্, মিন্‌ষের কথা শোনো !'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'দাও ওর টাকা দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নাও।'

কামিনী আবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—'রসিদ কিসের ? রসিদ আবার কী ! আমি কি খাজানা দিতে এসেছি, না খুনের আসামী ?'

বিনোদ হাসিল। বলিল, 'আজ্ঞে না মা-ঠাকরুণ, রসিদ আপনাকে দিতে হবে। আদালতে নালিশ করে যখন ডিক্রি পেয়েছেন তখন রসিদ না দিলে চলবে না।'

কামিনী বলিল, 'ও মা গো ! চলবে না। কেন চলবে না শুনি ! ডাকব দশজন লোক ?'

শ্যামসুন্দর চুপি চুপি বিনোদকে কাছে ডাকিয়া বলিল, 'একটা টিপ্‌সই নিয়ে টাকাটা দিয়ে দাও আমি পালাই'

বলিয়া সে চলিয়া গেল।

এমন শুধু ওই একজন নয়।

নালিশ করিয়া ডিক্রি পাইয়াছে পাঁচজন।

মনি-অর্ডার করিয়া প্রত্যেকের কাছে বংশলোচনবাবু টাকা পাঠাইতেন, এতদিন সে-সব কথা গোপন ছিল।

ইহা ছাড়া আরও যে কত তাহার অন্ত নাই।

মাঝে মাঝে এক-একজন আসে আর কান্নাকাটি করিতে থাকে। নালিশ-মোকর্দ্দমা তাহারা করে নাই।

প্রত্যেককেই কিছু কিছু দিয়া বিদায় করিতে হয়।

শ্যামসুন্দরের বিরক্তির আর সীমা থাকে না। বলে, 'তোমরা আর এসো না আমার কাছে। আদালতে যেয়ো।'

কিন্তু আদালতে যাওয়া নিরাপদ নয়। কাজেই বারণ করিলেও তাহারা শোনে না। শ্যামসুন্দরের পায়ে ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে থাকে।

সেদিন রবিবার। শ্যামসুন্দরের হাতে তেমন বিশেষ কিছু কাজ ছিল না। সকালে শহর হইতে ডাক্তার আসিয়াছিলেন। বলিয়া গেলেন, বাবুর জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই, কিন্তু তাঁহার পঙ্গু অবস্থা সহজে কাটিবে কি না কে জানে। বসিয়া বসিয়া শ্যামসুন্দর সেই কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময় বিধবা একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, পরণে সাদা থান, গায়ের রং পরিষ্কার, টানা-টানা চোখ,—বয়স বেশিই হইয়াছে, কিন্তু বুঝিবার উপায় নাই। সম্ভবত সম্ভ্রান্ত বংশের, সঙ্গে একটি বছর-চোদ্দর মেয়ে—পরমা সুন্দরী। এতদিন যাহারা আসিয়াছে এত সুন্দরী কেহ নয়। শ্যামসুন্দর সেদিকে তাকাইয়া সহসা তাহার চোখ ফিরাইতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি চান ?'

'আপনি কি বাবুর ছেলে ?'

ঘাড় নাড়িয়া শ্যামসুন্দর বলিল, 'হ্যাঁ।'

মেয়েকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইল, 'প্রণাম কর্ মলিনা।'

মলিনা মেয়েটির নাম।

মা'র আদেশ মত মলিনা হেঁটমুখে ধীরে ধীরে আগাইয়া গিয়া শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া আবার তাহার মায়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্যামসুন্দর তাহারই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। কপালে সিঁদুর। মেয়েটির বিবাহ হইয়া গেছে।

মেয়ের মা কথা বলিতেই শ্যামসুন্দর হঠাৎ একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া সেদিক হইতে মুখ ফিরাইল।

'আপনার বাবা আমায় চেনেন। শুনলাম তাঁর অসুখ। একবার দেখা করব।'

অন্য কেহ হইলে এ প্রস্তাবে শ্যামসুন্দর কিছুতেই সম্মত হইত না, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহাকে প্রত্যাখ্যান সে কিছুতেই করিতে পারিল না। মনে হইল, এ যেন অনুগ্রহ ভিক্ষা নয়, এ যেন আদেশ। মেয়েটি কথা বলিতে জানে।

শ্যামসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বলব ? কি বললে আপনাকে তিনি চিনবেন ?'

'আমাকে ?' বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া সে যেন চোখ বুজিয়া কি ভাবিল, বাহিরের দিকে একবার তাকাইল, তাহার পর বলিল, 'আমার নাম—সুরমা। কিন্তু নাম বললে তিনি হয়ত না চিনতেও পারেন ; বলুন—পান্নালাল বাবু উকিলের স্ত্রী এসেছে।'

শ্যামসুন্দর বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে একবার তাকাইল।

স্বামীর নাম সে এমন অবলীলাক্রমে মুখে আনিল কেমন করিয়া ?

যাই হোক, সে ঘরে লোকজন কেহ ছিল না। শ্যামসুন্দর বলিল, 'বসুন !'

বলিয়া সে তাহার বাবাকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'আসুন।'

'আসুন' বলিয়াই মলিনার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এই কি আপনার মেয়ে ?'

সুরমা বলিল, 'হ্যাঁ বাবা, এই আমার মেয়ে। ওই মেয়েটিই সম্বল।'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'বেশ মেয়ে।'

মলিনা শ্যামসুন্দরের মুখের পানে তাকাইয়াই আবার চোখ নামাইল।

চমৎকার দু'টি চোখ ! তার চেয়েও চমৎকার তার সে চোখের চাহনি। সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত তার সৌন্দর্য্য,—অনবদ্য,অপরূপ ! সেদিক হইতে চোখ ফিরাইতে শ্যামসুন্দরের ইচ্ছা করিল না।

তাহার দেহের মধ্যে পিতৃপিতামহের রক্ত বুঝি এতদিন পরে হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে !

মা ও মেয়েকে পথ দেখাইয়া শ্যামসুন্দর তাহার পিতার কক্ষে লইয়া গেল।

পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশায়িত বংশলোচনবাবু সুরমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, 'এসো !'

শ্যামসুন্দর ভাবিয়াছিল হয়ত ইহারা দেখা করিয়াই কিঞ্চিৎ দক্ষিণা লইয়া চলিয়া যাইবে তাই সে পিতার আদেশের অপেক্ষায় দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। বংশলোচনবাবু বলিলেন, 'বাড়ীর ভেতর এদের খাবার বলে' দাও শ্যামসুন্দর!'

একটা চাকর কিম্বা ঝি দিয়াও সে সংবাদ বাড়ীর ভিতর পাঠানো চলিত, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, শ্যামসুন্দর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শোনে।

এদিকে সুরমার মেয়ের কাছেও কিছু বলা চলে না।

শ্যামসুন্দর চলিয়া যাইতেছিল।

বংশলোচনবাবু আবার ডাকিলেন, 'শোন্!'

'একেও নিয়ে যা বাড়ীর ভেতর—বৌমার সঙ্গে গল্প গাছা করুক্।'

শ্যামসুন্দর হাতে যেন চাঁদ পাইল। বলিল, 'এসো!'

মলিনা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু কে আগে যাইবে তাহাই হইল সমস্যা।

শ্যামসুন্দরের ইচ্ছা মলিনা আগে আগে চলুক, সে তাহাকে দেখিতে দেখিতে যাইবে।

কিন্তু অপরিচিত স্থানে মলিনাই বা আগে আগে যায় কেমন করিয়া!

অগত্যা শ্যামসুন্দরকেই আগে আগে যাইতে হইল।

মলিনা পশ্চাতে।

শ্যামসুন্দর দু'পা আগাইয়া যায় আর ঘন-ঘন পিছন ফিরিয়া তাকায়।

'কোথায় বাড়ী বললে তোমাদের ?'

মলিনা বলিল, 'বিজয়গড় ।'

এত সুন্দর কণ্ঠস্বর বোধকরি সে জীবনে কখনও শোনে নাই ।

'কি নাম বললে তোমার—ভুলে গেলাম ।'

'মলিনা ।'

এবার দু'জন পাশাপাশি !

'বিজয়গড় থেকে কি তোমরা—?'

মলিনা শ্যামসুন্দরের মুখের পানে তাকাইল ।

'হেঁটে এসেছ ?'

মলিনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না ।'

'তোমায় বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে ।'

মলিনা ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসিল মাত্র ।

কি জিজ্ঞাসা করিবে শ্যামসুন্দর আর কথা খুঁজিয়া পায় না !

বলিল, উনি বুঝি তোমার মা ?'

'হুঁ ।' বলিয়া মলিনা অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে একবার তাকাইল। অবাক হইবারই কথা। এতক্ষণ পরে এ প্রশ্ন যে উঠিতে পারে সে কথা তাহার জানা ছিল না।

'বাড়ীতে কে কে আছে তোমাদের ?'

'কেউ নেই। মা আর আমি ।'

'বাবা তোমার উকিল ছিলেন, না ?'

'হ্যাঁ ।'

'কতদিন মারা গেছেন ?'

'এক বচ্ছর।'

'আজই কি তোমরা বাড়ী ফিরে' যাবে ?'

ঘাড় নাড়িয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া মলিনা বলিল, 'হ্যাঁ।'

কথাটা শ্যামসুন্দরের বুকে বিঁধিল। সহজে আর সে তাহাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে পারিল না। কিন্তু দেখা গেল, অন্দর্ মহলে যাইবার পথটা ছাড়িয়া দিয়া শ্যামসুন্দর মলিনাকে লইয়া সিঁড়ি ধরিয়া ভিতর বাড়ীর আর-একটা চত্বরে গিয়া নামিতেছে। নীচেটা দিনের বেলাও অন্ধকার। পুরাকালে হয়ত এখানে গাড়ী ঘোড়া পাল্‌কি ইত্যাদি থাকিত। এখন মাত্র একপাশে একটা পাল্‌কি নামানো। চুন-বালি-খসা বাকি কয়েকটা ঘর একেবারে খাঁ খাঁ করিতেছে। উঠানের উপর একগাদা ইঁট, চুন, সুর্কি যেখানে সেখানে ছড়ানো। মলিনার ভয় করিতে লাগিল।

শ্যামসুন্দরের বুকের ভিতরটাও টিপ্ টিপ্ করিতেছিল। বলিল, 'না, এদিকে ত' কেউ নেই, চল।' বলিয়া আবার তাহারা সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

শ্যামসুন্দর বলিল, 'আচ্ছা তোমাদের বিজয়গড়ে আমি যদি যাই ত' আমায় চিনতে পারবে মলিনা ?'

মলিনা ম্লান একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

শ্যামসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি শ্বশুরবাড়ী যাও না ?'

মলিনা সেকথার কোন জবাব দিল না। শ্যামসুন্দরের আগে আগে দু'তিন ধাপ সিঁড়ি সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

উপরে উঠিয়া আসিয়া শ্যামসুন্দর আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কথাটার জবাব দিলে না যে ?'

মলিনা হাসিল। কি চমৎকার সে হাসি! বলিল, 'একবার গিয়েছিলাম।'

কিন্তু সে-সব কথা বৃথা! একটিমাত্র কথা বলিবার জন্য শ্যামসুন্দরের বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিতেছিল। কথাটি এই, যে,—মলিনা, তোমায় আমার বড় ভাল লাগিয়াছে' তোমায় বড় ভালবাসিয়া ফেলিলাম।

অথচ কথাটা যে সে তাহাকে কেমন করিয়া বলিবে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না। এতক্ষণ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সোজা রাস্তা ছাড়িয়া বাঁকা পথ ধরিয়া উপরে উঠিয়া নীচে নামিয়া বলিবার চেষ্টাও সে কয়েকবার করিল, মনে-মনে কথাটা সে কতবার যে আওড়াইল তাহার ইয়ত্বা নাই, কিন্তু বলিতে সে কিছুতেই পারিল না।

এইবার সে আর থাকিতে না পারিয়া মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা মলিনা......এখানে তোমার......'

কিন্তু এম্‌নি অদৃষ্ট যে, কথাটা তাহার শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুমুখে রাণী-মা আসিয়া দাঁড়াইলেন।—'এই যে তোকেই ডাকতে যাচ্ছিলাম শ্যামসুন্দর,—এটি কে ?'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'এ মলিনা। বিজয়গড়ের পান্নালালবাবু উকিলের মেয়ে। এর মাও এসেছেন। বাবার সঙ্গে কথা বল্‌ছেন। যাও মা একে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও। বড় চমৎকার

মেয়ে।' বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া রাণীমার দিকে আগাইয়া দিল।

পরিচয়টা তাহার সে এমনভাবে দিল যেন ইহারা তাহার বহুকালের চেনা।

মলিনার চেহারা দেখিয়া রাণীমাও অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়াছিলেন। মলিনা হেঁট হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

'এসো মা এসো।' বলিয়া রাণী-মা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া পিঠে তাহার হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন, 'আমি যাচ্ছিলাম তোর কাছে কেন জানিস শ্যামসুন্দর? শহর থেকে ভাল একজন মেয়ে-ডাক্তার আনতে লোক পাঠিয়ে দে বাছা, বৌমার যে রকম অবস্থা দেখছি তাতে আমার ত' মনে হচ্ছে—আজই হোক্ কালই হোক্—একটা-কিছু হবেই। প্রথম পোয়াতি, আমার ত' বাবা ভয় করছে।'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'বেশ, তবে বিনোদকে দিই পাঠিয়ে।'

'তাই দে বাছা শীগ্‌গির।' বলিয়া মলিনাকে সঙ্গে লইয়া মা ভিতর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

সুরমা তাহার মেয়েকে লইয়া বংশলোচনবাবুর সঙ্গে একবারমাত্র দেখা করিতে আসে নাই, আসিয়াছে আশ্রয়প্রার্থী হইয়া।

স্বামী ছিলেন উকিল। ওকালতি করিয়া বিশেষ-কিছু করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর পর দেখা গেল, স্ত্রী কন্যার জন্য তিনি রাখিয়া গিয়াছেন মাত্র একশ' টাকা ঋণ। সুরমা নিজের গহনা বিক্রি করিয়া ঋণ শোধ করিল। তাহার পর নিজের ও মেয়ের খাওয়া-পরার্ জন্য বাকি যে গহনাগুলি ছিল তাহাও গেল। ভাবিয়াছিল, মেয়েকে শ্বশুরবাড়া পাঠাইয়া দিয়া নিজে যাহোক করিয়া চালাইবে, কিন্তু এম্‌নি দুরদৃষ্ট যে, তাহাও হইল না। জামাই আসিল না, শ্বশুরবাড়ীর চিঠির জবাবে সে যে চিঠিখানি লিখিয়া পাঠাইল তাহা যেমন সাংঘাতিক তেমান লজ্জাকর। লিখিল, আপনার মেয়েকে বিবাহ করা আমার উচিত হয় নাই, বিবাহের পর যে-সব ব্যাপার আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে আপনাদের উভয়ের চরিত্র সম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ হইয়াছে তাহা সত্য। সুতরাং আপনার মেয়েকে আমার বাড়া লইয়া আসিবার জন্য আমায় আর অনর্থক অনুরোধ করিবেন না।

সুরমা আর অনুরোধ করেও নাই।

না করিবার কারণ অবশ্য আছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত গোপনীয়। সুরমা চায় না যে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

সে আজ বেশি দিনের কথা নয়। স্বামী তখন বাঁচিয়া ছিলেন। সেই বৎসরই মলিনার বিবাহ হইয়াছে। জামাই আসিয়াছে।

স্বামীর মক্কেলের বড় অভাব যাঁহারা আসেন তাঁহাদের আদর যত্নের আধিক্য এত বেশি হইয়া পড়ে যে সুরমা বিরক্ত হইয়া ওঠে।

ছায়াছবি

বিজয়গড়ের আদালতে বংশলোচনবাবুর দুইটি মোকর্দ্দমা তখন চলিতেছিল। পান্নালালবাবুকে উকিল দিয়া তিনি নিজে তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। একে বড়লোক, তায় মক্কেল। ভবিষ্যতে তাঁহার সমস্ত মামলা মোকর্দ্দমাই যাহাতে তাঁহার নিজের হাতে আসে তাহার জন্য বংশলোচন বাবুকে স্থান দিলেন তাঁহার নিজের বাড়ীর ভিতর। সুরমাকে কাছে ডাকিয়া বাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়া পান্নালালবাবু বলিলেন, 'আজ তোমার কম সৌভাগ্য নয় সুরমা উনি যে আমার বাড়ী অতিথি হবেন এ আশা আমি জীবনে কোনোদিন করিনি।' স্ত্রীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, 'আদর যত্নের ত্রুটি যেন কিছু না হয়, লোকটাকে হাতে রাখলে আমাদেরই লাভ।'

যাই হোক, হাতে রাখিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। পান্নালালবাবু সন্ধ্যায় প্রতিদিন দাবা খেলিবার জন্য বগলাবাবুর বৈঠকখানায় আড্ডা দেন। সেদিন বংশলোচনবাবু বাড়ীতে। যাইবার ইচ্ছা বিশেষ ছিল না, কিন্তু একে দাবা খেলার টান, তায় আবার বগলাবাবু টানাটানি করিতে লাগিলেন,—বাধ্য হইয়া যাইতে হইল।

জামাই গিয়াছিল বেড়াইতে। ফিরিতে তাহারও দেরি হয়।

বাড়ীতে মা ও মেয়ে।

মেয়েকে নীচে রান্না ঘরে রাখিয়া সুরমা গেল বংশলোচনবাবুকে চা ও জলখাবার দিতে।

দিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিল না।

রান্নাঘরে অপেক্ষা করিয়া করিয়া মলিনা হায়রাণ হইয়া উঠিল। উনানে তরকারি পুড়িয়া যাইতেছিল। কড়াইটা নামাইয়া দিয়া রান্নাঘরে শিকল টানিয়া মলিনা তাহার মাকে ডাকিবার জন্য উপরে উঠিয়া গেল।

উঠিয়া গিয়া দেখে, বংশলোচনবাবুকে যে-ঘরটা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, সে-ঘর অন্ধকার। অন্ধকারে ঠুন্ করিয়া একবার চুড়ির শব্দ হইল। মলিনার গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হইল না। ডাকিবে কি ডাকিবে না ভাবিয়া সেইখানেই একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, হঠাৎ অন্ধকারে ফস্ করিয়া একটা দেশলাই জ্বলিয়া উঠিল। মলিনা দেখিল, স্বামী তাহার কোন্ সময় বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে যে কতক্ষণ সেখানে আসিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে মলিনা তাহা টেরও পায় নাই। দেশলাই জ্বলিবা-মাত্র বংশলোচনবাবুর ঘরের ভিতর ঝন্ ঝন্ করিয়া চুড়ির শব্দ হইল। সুরমার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল,—'কে মা মলিনা, আয় ত' মা দেশলাইটা নিয়ে, বাতিটা হঠাৎ নিবে গেল।'

বলিয়াই তাকাইয়া দেখে, জুতার শব্দ করিয়া অন্ধকারে কে যেন পার হইয়া যাইতেছে।

জামাই ছাড়া আর কে?

'এই যে, পেয়েছি দেশলাই।' বলিয়া বংশলোচনবাবু নিজেই দেশলাই জ্বালাইয়া লণ্ঠন জ্বালিলেন।

কাঁপিতে কাঁপিতে সুরমা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। নীচে নামিয়া গিয়া দেখে, রান্নাঘরে হেঁটমুখে মলিনা

বসিয়া আছে। সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, 'সরোজকে দেখলাম, না? কোথায় গেল সে?'

জামাইএর নাম—সরোজ।

মলিনা বলিল, 'বাইরের ঘরে।'

সুরমা বলিল, 'আলোটা নিবে গিছ্‌ল, ছি ছি কি যে মনে করলে কে জানে।'

মলিনা হেঁটমুখে বলিল, 'বলে' গেল—তোমার মায়ের কাণ্ড ছ্যাখ।'

'ছি, ছি, গল্প করতে পেলে উনি আর কিছু চান না। চা দিতে গেলাম। বললেন, বসুন দুটো কথা কই। কথা কইতে কইতে আলোটা গেল নিবে। দেশলাই আর খুঁজে পাওয়া যায় না! সরোজকে ডাকি।'

বলিয়া নিজেই সুরমা উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল, 'সরোজ! সরোজ!'

সরোজ আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কি বলছেন?'

কথা বলিতে গিয়া সুরমার মাথা কাটা গেল। যে কথা বলিবার জন্য তাহাকে সে ডাকিল সেকথা কিছুতেই সে বলিতে পারিল না। বলিল, 'এসো বাবা, তোমায় জল খেতে দিই। শ্বশুর যে তোমার কখন আসবেন কে জানে।'

বলিয়া নিজের হাতে আসন পাতিয়া জল গড়াইয়া সরোজকে খাইতে বসাইয়া নিজে সুমুখে বসিয়া কথা পাড়িল।

'শ্বশুরটি তোমার এমন মানুষ, এত করে' বললাম—আমার

সঙ্গে আলাপ তুমি না-ই বা করে’ দিলে। কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না, বললেন, মস্ত বড় জমিদার, মামলা-মোকর্দ্দমা পেতে হ’লে ওরকম দু’একটা লোক হাতে থাকা ভালো।—তা ভদ্রলোক বড় ভালমানুষ। দিদি দিদি করে’ আমায় একেবারে অস্থির করে’ তুলেছেন। চা দিতে গিয়েছিলাম, বলছিলেন, তোমার মেয়ে-জামাইকে নিয়ে আমার বাড়ী একবার যেতে হবে দিদি! সেই কথাই হচ্ছিল। হঠাৎ আলোটা গেল নিবে! দেশলাইটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তুমি বুঝি ভেবেছিলে, ঘরে কেউ নেই! না? তোমায় এত করে’ ডাকলাম, তুমি চলে এলে। বলছিলেন, আহা, জামাইটি তোমার বড় ভাল হয়েছে দিদি। ডাকো, বসে বসে’ দুটো গল্প করি। এত গল্পও উনি করতে পারেন!’

সরোজ একটি কথাও বলিল না। হেঁটমুখে খাওয়া শেষ করিয়া আবার হেঁটমুখেই উঠিয়া গেল।

পরের দিন সকালেই সে বাড়ী রওনা হইল এবং সেই যে গেল আর একটি দিনের জন্যও আসিল না।

মলিনা চিঠি দিত, সরোজ জবাব দিত না।

তাহার পর পান্নালালবাবু মারা গেলেন।

মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার জন্য সুরমা নিজে চিঠি লিখিল।

তাহার ত’ সেই জবাব!

শ্যামসুন্দর শুনিল, সুরমা ও তাহার কন্যা মলিনা তাহাদেরই বাড়ীতে থাকিবে। সুরমা রান্না করিবে।

এ দুর্দ্দিনে ইহা ছাড়া তাহাদের আর কোনও উপায় ছিল না।

শ্যামসুন্দর শুনিল তাহার মা'র কাছে।

শুনিয়া আনন্দ যেন তাহার আর ধরে না!

বলিল, 'বেশ হলো। আহা, থাক্।—কিন্তু কেন মা, উনি না উকিলের স্ত্রী?'

মা বলিলেন, 'উকিলের স্ত্রী হলেই কি আর দুঃখ কষ্ট হতে নেই বাবা! ওদের কষ্টের কথা তোর বাবার মুখে যা শুনলাম, আমার চোখে জল এলো।'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'মেয়েটির ত' বিয়ে হয়ে গেছে। সে ত' শ্বশুর বাড়ী চলে যাবে!'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, বিয়ে হয়েছে বটে, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। জামাইটা মাতাল বদমায়েস্ দুষ্টুর একশেষ! আহা, অমন লক্ষ্মীর মত মেয়ে, তবু সেটা একবার ওর পানে ভুলেও তাকায় না। নিয়ে যায় না, আসেও না।'

আর বেশি কিছু শুনিবার প্রয়োজন শ্যামসুন্দরের ছিল না। ডাক্তার আসিল কিনা দেখিবার জন্য সে উঠিয়া গেল।

ছেলে হইল না হইল না করিয়া অনেক কষ্টে কঙ্কাবতীর একটি ছেলে যদি বা হইল, কঙ্কাবতী পড়িল অসুখে। আঁতুর ঘর হইতে সে আর উঠিল না।

মেয়ে-ডাক্তার বাড়ীতেই রহিল। শহর হইতে মোটর-গাড়ী করিয়া সাহেব-ডাক্তার আসিল। শ্যামসুন্দর টাকা খরচ করিতে কসুর করিল না কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, পনের দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগের পর কঙ্কাবতী তাহার সেই ছেলেটিকে কোলের কাছে লইয়া, স্বামীকে কাছে ডাকিয়া সেই যে চোখ বুজিল সে-চোখ আর খুলিল না।

পনর দিনের মা-মরা অতটুকু ছেলে—কেমন করিয়া যে মানুষ হইবে, কেমন করিয়া যে বাঁচাইয়া তুলিবে, সেই হইল সকলের ভাবনা। রাণী-মা আদর-যত্ন করিতে লাগিলেন।

সুরমা বলিলেন, আপনাকে কিছু করতে হবে না দিদি, আমার মেয়ে মলিনা ওকে মানুষ করবে।'

কাজেও হইল তাই।

ছেলে চব্বিশ ঘণ্টা মলিনার কোলেই থাকে। মলিনাই তাহাকে নিজের ছেলের মত মানুষ করে।

বংশলোচনবাবু কাহাকেও কিছু বলেন না। চুপ করিয়া ভাবেন, বুঝি তাঁহারই পাপে এই কাণ্ড ঘটিল।

রাণী-মা ছেলের আবার বিবাহের প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

বংশলোচনবাবু বলেন, 'নিশ্চয়। ওই একটুকু ছেলে—মরে কি বাঁচে তার ঠিক নেই, ওর ওপর ভরসা করলে ত' চলবে না আমাদের। বংশ লোপ হয়ে যাবে যে ?'

রাণী-মা বলেন, 'তবে তুমি তাই বোলো শ্যামসুন্দরকে।'

বংশলোচনবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলেন, 'না আমি না, তুমি বোলো।'

মা-ই বলিলেন।

কিন্তু শ্যামসুন্দর একেবারেই নারাজ।

হাসিয়া বলে, 'তুমি পাগল হয়েছ মা! বিয়ে আবার করতে যাব কি জন্যে ? বেশ আছি।'

রাণী-মা জেদ ধরিয়া বসেন।—'না বাবা, এমন ফাঁকা ঘর, চব্বিশ ঘণ্টা খাঁ-খাঁ করছে। বৌ নাহ'লে সাজবে কেন ? আমরা আর ক'দিন বাছা!'

কিন্তু কিছুতেই না। শ্যামসুন্দর বলে, 'না না—কিছুতেই না।' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। বলে, 'অমন যদি করবে মা, তাহলে পালাব আমি বাড়ী থেকে।'

ইহার উপর আর কথা চলে না।

রাণীমাও চুপ করেন।

বংশলোচনবাবুও চুপ।

চুপ করে না শুধু মলিনা।

শ্যামসুন্দরকে একা পাইলেই বলে,—'নাও তোমার ছেলে, আমি পারব না মানুষ করতে। বিয়ে করতে বলা হচ্ছে, কেন করবে না? লোঁকে বলবে কি!'

শ্যামসুন্দর হাসিয়া বলে, 'বলবে তোমার মাথা!'

মলিনা বলে, 'আমি যদি শ্বশুর বাড়ী চলে যাই! কে তোমার এই কাঁদুনে ছেলে মানুষ করবে বল ত?'

শ্যামসুন্দর বলে, 'হ্যাঁ বলেছ বেশ! সৎ-মা মানুষ করঁবে কেমন?'

মলিনা বলে, 'করবে না বললেই হলো কি না! নিশ্চয় করবে। তুমি বিয়ে কর।'

শ্যামসুন্দর বলে, 'করব না। যদি করতে হয় ত'—'

বলিয়া সে এমন একটা কথা বলিয়া বসে যাহার জবাবে মলিনা আর একটি কথাও বলিতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপার এম্‌নি, যে-কথা মলিনা মাত্র উপহাস করিয়া বলিয়াছিল তাহাই একদিন সত্য হইয়া গেল।

মলিনার স্বামী সরোজ একদিন অনেক খোঁজ করিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া বংশলোচনবাবুর বাড়ী আসিয়া হাজির!

সুরমা ত' অবাক্! মলিনাও অবাক্।

সরোজ বলে, 'স্ত্রীকে আমি আমার নিয়ে যাব এখান থেকে।'

কথাটা শুনিয়া রাণী-মা বলেন, 'তোর কপাল সুরমা! এমন করে' যে ভগবান মুখ তুলে চাইবেন হঠাৎ, তাই বা কে জানতো!'

সুরমা কিন্তু ঠিক আশ্বস্ত হইতে পারে না। মেয়েকে লইয়া গিয়া সে কষ্ট যন্ত্রণা দিবে কিনা তাই-বা কে জানে। বলিল 'কি জানি দিদি! এতদিন পরে আজ হঠাৎ নিতে আসবার মানে কিছু বুঝতে পারছি না।'

রাণী-মা বুঝাইলেন যে, না, হয়ত তাহার সুমতি হইয়াছে, নেশা ভাং গুলা হয় ত' সে এখন পরিত্যাগ করিয়াছে।

.বলিলেন, 'ভাবনা কি সুরমা, গায়ে গয়না-গাঁটি থাকতো ত' মনে হ'তো বুঝি-বা ওইগুলোর লোভেই এসেছে। তাও যখন নেই তখন আর তোর চিন্তা কি। দে পাঠিয়ে।'

'তাই দিই।' বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুরমা ভাবিতে ভাবিতে মলিনার কাছে গেল।

মলিনা কি আর বলিবে! ছল-ছল চোখে মা'র মুখের পানে তাকাইয়া আবার মাথা নামাইল। মুখে কিছুই বলিল না।

মা বুঝিলেন, মেয়ের যাইবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু এই জ্বলন্ত অগ্নির মত তাহার রূপবতী ষোড়শী কন্যাকে ঘরে রাখিয়াই বা তিনি করিবেন কি!

—যাওয়াই ভালো।

তাহাই হইল মলিনার যাওয়াই স্থির।

শ্যামসুন্দর সেদিন বাহিরে বাহিরেই কাটাইল। খাইবার সময় যদিই-বা সে ঘরে ঢুকিল, কাহারও পানে মুখ তুলিয়া চাহিল না. কথা কহিল না, মুখখানি দেখিলেই মনে হয়, কিসের যেন গভীর দুঃখে একেবারে ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে।

সুরমা কাছে দাঁড়াইয়াছিল, রাণী-মা বলিলেন, 'দেখেছিস সুরমা, দেখলে বুক ফেটে যায় না?'

কথাটা সুরমা ভাল বুঝিতে পারিল না, চুপ করিয়া মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

রাণী-মা বলিলেন, 'পুরুষ মানুষ—জোর করে' চুপ করে' করে' থাকে,—আজ মনে পড়েছে বৌমাকে। মলিনা চলে' গেলে ছেলেটার কষ্ট হবে।'

সুরমা এতক্ষণে বুঝিল। বলিল, 'তা হবে বই কি দিদি! মলিনা ছেলেকে কোলে নিয়ে থাকে, মনে হয় যেন ওরই ছেলে।'

রাণী-মা বলিলেন, 'শ্যামসুন্দরের বিয়ে না করলে কি চলে বোন! কিন্তু বললে শোনে না, কি যে করি তাই ভাবছি।'

পরদিন বেলা দশটায় সরোজদের যাইবার ট্রেণ।

সারারাত্রি সুরমার চোখে ঘুম আসিল না। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া সুরমা উনানে আগুন দিল। তাহার পর স্নান করিয়া কাপড় কাচিয়া মেয়ে-জামাইএর জন্য রান্না করিতে বসিল।

মলিনাও সেদিন সকাল-সকাল উঠিয়া আসিয়া খোকার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। গত রাত্রে খোকা ছিল রাণীমার কাছে। অনেক ক্ষণ তাহাকে সে দেখিতে পায় নাই। আসিয়াই সে হেঁট হইয়া আদর করিয়া কাতুকুতু দিয়া তাহাকে হাসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাণী-মা গিয়াছিলেন বাবুর কাছে। মা রান্নাঘরে। শ্যামসুন্দর কোথায় গিয়াছে কে জানে।

বিনা দোষে একবার তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহার নামে কলঙ্ক রটাইয়া এই যে স্বামী আবার তাহাকে লইতে আসিয়াছে, ইহা তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। আবার কবে যে সে শ্বশুর বাড়ী হইতে এখানে ফিরিবে কে জানে। স্বামীর হাবভাব কথাবার্ত্তা ব্যবহার দেখিয়া বিশেষ ভাল বলিয়া মনে হইল না। রাত্রে একবার সে বলিয়াছিল, তাহাকে সে তাহার মা'র কাছ হইতে চিরজীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইতে চায়। জবাবে মলিনা বলিয়াছিল, সে যাইবে না। তাহার পর এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা তাহাদের হয় নাই। কথাটা সরোজ উপহাস করিয়া বলিয়াছিল কি ইহাই তাহার সত্য মনের ভাব—তাই বা কে জানে!

খোকাকে আদর করিতে করিতে মলিনা এমনি-সব নানা কথা ভাবিতেছিল। সহসা পশ্চাতে কাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া তাকাইয়া দেখে, শ্যামসুন্দর।

শ্যামসুন্দর বলিল, 'জামা কাপড়, আর্শী, সাবান, আলতা তেল সবাই তোমার ওই বাক্সে সাজিয়ে দিয়েছি। চিঠির কাগজ, খাম, পোষ্টকার্ড সবই আছে।'

মলিনা বলিল, 'সারারাত ওই-সবই করেছ বুঝি ?'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'চিঠি লিখো। কষ্ট হ'লে তৎক্ষণাৎ জানিয়ো। নিয়ে আসব গিয়ে।'

ঘাড় নাড়িয়া মলিনা তাহার সম্মতি জানাইতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শ্যামসুন্দর বলিল, 'ছি, কেঁদো না।'

কাঁদিতে সে নিষেধ করিল বটে, কিন্তু দেখা গেল তাহারও চোখে জল।

আরও বোধ করি তাহারা কিছু বলিত, কিন্তু রাণী মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

মলিনা তখনও তাহার কান্না থামাইতে পারে নাই। রাণী-মা বলিলেন, 'ছি, কাঁদিসনে মা, আবার তোকে নিয়ে আসব। স্বামীর বাড়ী যেতে কাঁদতে আছে। ছি !'

মলিনা চোখের জল মুছিল। বলিল, 'খোকার খবর যেন আমি পাই মা।'

মা বলিলেন, 'নিশ্চয় পাবি। প্রতি সপ্তাহে একটি করে' চিঠি লিখে দিস্ বাবা শ্যামসুন্দর।'

ঘর হইতে শ্যামসুন্দর বাহির হইয়া যাইতেছিল। যাইতে যাইতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'দেবো।'

রাণী-মা বলিলেন, 'পাল্‌কি-বেহারাদের একবার খবর দিয়ে দিস্ বাবা, দশটার সময় ট্রেণ, যেন একটু সময় থাকতে আসে।'

পাল্‌কি ঠিক সময় থাকিতেই আসিল।

মেয়ে-জামাইএর খাওয়া চুকিয়া গেলে সুরমা আর তাহার চোখের জল আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিল না। মলিনাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মা'ও যত কাঁদে, মেয়েও তত কাঁদে।

কেহ কাহাকেও চুপ করায় না।

শেষে রাণী-মা আসিয়া থামাইয়া দিলেন।—'বলি হ্যাঁ রে সুরমা, তুইও কি ছেলেমানুষ হলি নাকি? ছেড়ে দে। কাপড় ছেড়ে ও আলতা-টাল্‌তা পরুক্‌। সময় হ'য়ে এলো।'

মলিনাকে ছাড়িয়া দিয়া সুরমা বলিল, 'ওই ত' আমার যথাসর্ব্বস্ব দিদি। ওকে ছেড়ে আমি থাকব কেমন করে' ভাবছি। হয়ে অব্‌ধি একটি দিনের জন্যেও আমার কাছছাড়া হয় নি। সেই বিয়ের সময় একবার, আর এই।'

রাণী-মা বুঝাইলেন।—'কি আর করবি বল্‌! মেয়ে যে! পরের বাড়ীতেই জীবন কাটে। আবার নিয়ে আসব। আবার যাবে। ছেলে হবে, মেয়ে হবে, সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করবে—এই ত' সুখ সুরমা।

সুরমার চোখ দিয়া আবার দর্‌ দর্‌ করিয়া জল গড়াইয়া আসিল। বলিল, 'সে কি আর জানিনে দিদি, কিন্তু মন মানে না যে!'

মন না মানিলেও পাঠাইতে হইল।

মলিনা সকলকে একটি করিয়া প্রণাম করিয়া শ্যামসুন্দরকে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না। অগত্যা হেঁটমুখে সজল চোখে তাহাকে তাহার স্বামীর সঙ্গে পাল্‌কীতে গিয়া উঠিতে হইল।

ষ্টেশনে গিয়া দেখে, দু'হাঁড়ি সন্দেশ লইয়া দু'খানি টিকিট কিনিয়া শ্যামসুন্দর তাহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। মলিনার মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটিল। হাসিতে হাসিতে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে নতজানু হইয়া প্রণাম করিল।

প্রণাম তাহার আর শেষ হয় না!

শ্যামসুন্দর দু'হাত দিয়া তাহাকে তুলিতে গিয়া দেখে, তাহার সেই আরক্তিম দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

ট্রেণ ছাড়িল।

ট্রেণের জানালা দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া যতক্ষণ দেখা গেল, মলিনা সজল চোখে শ্যামসুন্দরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর চোখের সুমুখ হইতে সবই যখন অদৃশ্য হইয়া গেল মলিনা তখন তাহার মুখ ফিরাইয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিল।

কিন্তু যত মোছে চোখের জল ততই আবার গড়াইয়া পড়ে।

সরোজ পাশেই বসিয়া ছিল। গাড়ীতে মাত্র তাহারা দু'জন। লজ্জা করিবার মত তৃতীয় ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। কাজেই সরোজ তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'বলি অত কেন?'

মলিনা বুঝিতে পারিল না। সরোজের মুখের পানে একবার তাকাইল মাত্র।

সরোজ দাঁত কিস্‌মিস্ করিতেছিল। আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ও তোমার কে?'।

মলিনা যেমন জানালার বাহিরে তাকাইয়া ছিল তেম্‌নি তাকাইয়াই বলিল, 'কেউ নয়।'

'তবে অত কেন?'

মলিনা এইবার চোখ ফিরাইল। জোরে জোরে বলিল, 'অত কী?'

সরোজ বলিল, 'অত বাড়াবাড়ি?'

'কিসের বাড়াবাড়ি?'

দৃঢ়কণ্ঠে সরোজ বলিল, 'ভালবাসার।'

জবাব না দিয়া মলিনা আবার জানালার দিকে মুখ ফিরাইল।

সরোজ বলিল, 'জবাব দাও।'

মলিনা জিজ্ঞাসা করিল, 'কিসের জবাব?'

ভেংচি কাটিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সরোজ বলিল, 'কিসের

জবাব! মারতে হয় জুতো ওই মুখে—তবে জব্দ। চল তুমি একবার আমার বাড়ী চল—তারপর দেখাচ্ছি মজা।'

শ্বশুরবাড়ী হইতে মালিনা চিঠি লিখিল।

চিঠি লিখিল শ্যামসুন্দরের নামে একখানি, মা'র নামে একখানি।

মাকে লিখিল, ভালই আছি। তুমি ভাবিও না মা। যখন তোমার ইচ্ছা হইবে তখনই লইয়া যাইবে।

শ্যামসুন্দরকে কি যে লিখিল সেকথা কেহই জানিল না। সে তাহা মনে-মনে পড়িয়া মনে-মনেই রাখিল।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, 'ভালই আছে, না কি বল বাবা শ্যামসুন্দর?'

শ্যামসুন্দর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

তাহার পর চিঠি আসে—

সব চিঠিই শ্যামসুন্দরের নামে।

মা'র নামে চিঠি আর সে দেয় না। মা-ই বরং শ্যামসুন্দরকে মাঝে-মাঝে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁ বাবা, চিঠি এসেছে মলিনার?'

শ্যামসুন্দর বলে, 'হ্যাঁ এসেছে। ভাল আছে।'

সুরমা আবার জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁ বাবা, ভাল থাকা ছাড়া আর-কিছু লেখে না?'

'হ্যাঁ লেখে। আপনাদের খবর জানতে চায়। খোকার খবর জানতে চায়।'

কিন্তু মা'র মন মানে না। বলে, 'আমার কি মনে হয় জানো শ্যামসুন্দর? মনে হয়—হয় ত তার সেখানে খুব কষ্ট হচ্ছে, হয় ত তারা চব্বিশ ঘণ্টা বক্‌ছে, মারছে, তাই বোধ হয় সে আর আমায় চিঠি লেখে না। তোমায় লেখে, তুমি আমায় বল না। ভাবো হয়ত' আমি দুঃখু করব, কাঁদব।'

শ্যামসুন্দর হাসে। বলে, 'না। সে ভালই আছে।'

আগামী মাসে খোকাবাবুর অন্নপ্রাশন। সুরমার ইচ্ছা—সে সময় মলিনাকে একবার লইয়া আসে। কিন্তু পরের বাড়ী—নিজের মত করিয়া আশ্রয় দিয়াছে—এই পর্য্যন্ত। জোর করিয়া বলা তাহার সাজে না।

তবু সে বলিল।

বলিল, 'আহা, খোকাকে আমার মলিনা কতদিন দেখেনি। খোকার জন্যে সে হয়ত ছট্‌ফট্‌ করে।'

শ্যামসুন্দর চুপ করিয়া রহিল।

সুরমা বলিল, 'আসছে মাসে খোকার ভাত। ভাতের সময় মলিনা হয়ত আসতে চাইবে।'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'হ্যাঁ আসবে বই কি।'

'কিন্তু পাঠালে হয়! যদি না পাঠায়?'

'কেন পাঠাবে না। নিশ্চয় পাঠাবে।'

সুরমা বলিল, 'তাহ'লে এখন থেকে একখানা চিঠি তুমি লিখে দিও বাবা!'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'লিখব।'

চিঠি সে লিখিয়াছিল।

কিন্তু চিঠিতে কিছু হয় নাই। শ্যামসুন্দর সরোজকেও নিমন্ত্রণ করিয়া অন্নপ্রাশনের আগের দিন লোক পাঠাইয়াছিল। লিখিয়াছিল 'আপনি না আসিলে বিশেষ দুঃখিত হইব। মলিনাকে সঙ্গে লইয়া আপনি আসিবেন।'

অন্নপ্রাশনের দিন লোক ফিরিয়া আসিল।

তাহারা ত' আসেই নাই, এমন-কি সহজ ভদ্রতার খাতিরে সরোজ তাহার চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দেয় নাই।

সকলেই দুঃখিত হইল। আহা, আজ এই আনন্দের দিনে মলিনাকে পাঠাইল না!

যে-লোক তাহাদের আনিতে গিয়াছিল, রাণী-মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁরে, কি বললে সে?'

'বললেন, 'পাঠাব না।'

'মলিনা কিছু বলেনি?'

'তিনি বড় কাঁদছিলেন মা। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বোলো —মলিনা মরেছে।'

শুনিয়া সুরমা কাঁদিতে লাগিল। রাণীমাও চক্ষের জল ফেলিলেন।

শ্যামসুন্দর চুপ করিয়া রহিল।

বংশলোচনবাবু একটা আরাম-কেদারার উপর শুইয়া শুইয়া অন্নপ্রাশন দেখিতেছিলেন। শক্তিহীন হইলেও তাঁহার তেজ তখনও যায় নাই।

বলিলেন, 'বটে! আমার বাড়ীতে মেয়ে পাঠাবে, বলে কিনা পাঠাব না! ওরে শোন্ শ্যামসুন্দর! একদিন তুই নিজে যা। গিয়ে ভাল করে' বল্। না শোনে, জোর করে' নিয়ে আয়। মেয়ের অমন শ্বশুরবাড়ী চাই না।'

সুরমা বলিল, 'সেই ভাল। মেয়ে বেঁচে থাকতে একটিবার যদি আমি দেখতেই না পেলাম তবে আর—'

রাণী-মা কথায় বাধা দিলেন। বলিলেন, 'না সুরমা, দেখতে না পেলে দুঃখু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু কি করবি বল্, স্বামীর ঘরে হাজার কষ্টেও যদি সে দিন কাটায়, মেয়ে মানুষের সেই ভালো। পাঠাবে বই-কি! আজ পাঠালে না, আবার দুদিন পরে পাঠাবে দেখিস্।'

রাণীমার কথায় সকলেই আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু খোকার অন্নপ্রাশনের দিন মলিনার অনুপস্থিতির ব্যথাটা কাহারও মনেই কম বাজিল না।

অন্নপ্রাশনের পর শ্যামসুন্দরের কাছে মলিনার একখানি চিঠি আসিল। চিঠিখানি প্রকাণ্ড। কিন্তু কি যে সে তাহাতে লিখিয়াছে সে কথা শ্যামসুন্দর কাহাকেও জানাইল না।

বাড়ীতে পিওন আসিলেই সুরমা তাহা টের পাইত।

সেদিনও সে শ্যামসুন্দরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।—মলিনার চিঠি বুঝি আর আসেনি ?'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'এসেছে। ভাল আছে। লিখেছে, খোকার কি নাম হলো জানাবেন।'

সুরমার চোখ দুইটা ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। চোখ মুছিয়া সে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া আড়ালে বোধ করি কোথাও কাঁদিতে গেল।

তাহার পর চিঠিপত্র একেবারেই বন্ধ।

মাস দুই কোনো খবর না পাইয়া শ্যামসুন্দর আবার একটা লোক পাঠাইল।

লোকের হাতে মলিনা চিঠি দিয়াছে।

চিঠি এবার আর শ্যামসুন্দরের নামে নয়। সুরমার নামে।

মলিনা অন্তঃস্বত্বা।

কথাটা সকলেই শুনিল।

রাণী-মা বলিলেন, ‘দেখলি সুরমা, ঝগড়াঝাঁটি করাটাই কি উচিত হতো! মেয়ের কপালে সুখ যদি থাকে ত' সে কেউ বন্ধ করতে পারে না। আহা, মলিনা আমার সুখী হোক বাছা!’

এ সংবাদ শুনিয়া সুরমারও আনন্দ কম হয় নাই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ‘কিন্তু নাতি নাতনী হ'লে তাও হয় ত দেখতে পাব না দিদি! জীবনে যদি আর তাকে কোনোদিন না-ই পাঠায় ত'......কি আর করব বল, আমার অদৃষ্ট!’

রাণী-মা কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত বিশ্বাস হারান নাই। বলিলেন, ‘পাঠাবে সুরমা, পাঠাবে। এবার আর না পাঠিয়ে যাবে কোথায়!’

সুরমা বলিল, ‘তাই দেখি দিদি! তোমার কথাই সত্যি হোক্!’

প্রথম পোয়াতি। মলিনার জন্য সুরমার ভাবনা হইবারই কথা।

ভাবনা নিবৃত্তি হইল সেইদিন—শ্যামসুন্দর যেদিন সংবাদ দিল—মলিনার একটি মেয়ে হইয়াছে।

মেয়েটিকে দেখিবার জন্য সুরমা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই।

মলিনা নিজে চিঠি লিখিল,—মেয়ে দেখিতে ঠিক তাহারই মত হইয়াছে। মাথায় একমাথা কালো কোঁকড়া চুল। দিব্যি

গোলগাল মোটাসোটা,—জন্মিয়া অবধি একটি দিনের জন্যও অসুখ-বিসুখ কিছু হয় নাই।

সুরমা সেইদিন হইতে একটি অনবদ্য ফুলের মত দেবকন্যার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।—কবে যে তাহাকে দেখিবে কে জানে।

একমাস গেল,

—দু'মাস গেল,

তিন মাস।

থাকিতে আর যেন পারে না।

রাণীমাকে বলিয়া কহিয়া অনেক করিয়া সুরমা রাজি করিল।

এই বলিয়া রাজি করিল যে, খুকুমণির অন্নপ্রাশনের সময় শ্যামসুন্দরকে লইয়া সে নিজে যাইবে। গিয়া একটিবারমাত্র সে দেখিয়া আসিবে।

শ্যামসুন্দর প্রস্তুত হইয়াই ছিল।

চিঠির অপেক্ষা না করিয়াই অন্নপ্রাশনের আগের দিন খুকির জন্য খুকির মায়ের জন্য প্রচুর জিনিষপত্র লইয়া সুরমাকে লইয়া শ্যামসুন্দর মলিনার শ্বশুর বাড়ী রওনা হইল।

সরোজ বাড়ী ছিল না, হাট-বাজার করিবার জন্য শহরে গিয়াছিল।

ফিরিয়া আসিয়া ইহাদের দেখিয়া ত' রাগিয়া আগুন।

স্পষ্ট সুরমার সাক্ষাতেই বলিয়া বসিল, 'কেন এলেন আপনি? কে আসতে বলেছে আপনাকে?

সুরমা মাথা হেঁট করিয়া খুকিকে কোলে লইয়া বসিয়া রহিল।

মলিনা কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। চোখ দিয়া তাহার আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। রাগে মুখ দিয়া সহজে কথা বাহির হইতেছিল না। বলিল, 'ছোটলোক! আমার মা এসেছে আমার বাড়ী— ছোটলোকের কথা শোনো! ছি!'

সরোজও রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'কী! ছোটলোক! তোর সাতগুষ্টি ছোটলোক! বাড়ী আমার! তোর নয়। আমার বাড়ীতে তোর জড়বংশের কাউকে আমি ঢুকতে দেব না দেব না দেব না।'

মলিনার চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল গড়াইয়া আসিল। আর একটি কথাও সে বলিতে পারিল না।

সুরমা দেখিল তাহার আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। বলিল, 'আমি মা, আমার কি একটিবার দেখবার সাধ হয় না বাবা। কতদিন দেখিনি বলত?'

সরোজ হঠাৎ নরম হইয়া বলিল, 'চিঠি লিখলেই ত' আমি নিজে নিয়ে আসতাম গিয়ে। ও ছোঁড়া কেন আসবে? ও কেন আসবে আমার বাড়ী?'

সুরমা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। বলিল 'কে?'

সরোজ শ্যামসুন্দরের নাম বলিতে যাইতেছিল। মলিনা লজ্জা শরম ভুলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার মায়ের সাক্ষাতেই সরোজের মুখখানা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'যাও তুমি এখান থেকে। বেরোও।'

বলিয়া ঠেলিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া হড়াম্ করিয়া পশ্চাতে তাহার দরজাটা বন্ধ করিয়া খিল্ আঁটিয়া দিল।

রাগে সে তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'গাঁজাখোর! পাড়ার ছোঁড়াদের সঙ্গে গাঁজা খেতে শিখেছে মা, ওর মাথার আর এখন ঠিক থাকে না।'

সুরমা কাঁদিতেছিল। চোখের জল মুছিয়া বলিল, আমরা তা'হলে চলে যাই মা মলিনা! কাজ নেই আর কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে।'

মলিনা বলিল, 'তাহ'লে আমাকেও তোমরা নিয়ে চল মা। আমিও আর এখানে থাকতে চাই না।'

সুরমা বলিল, 'না মা, তা হয় না। স্বামীর ঘর যদি পেয়েছিস মা ত' আর আমি মা হয়ে তোর সর্ব্বনাশ করব না। আমি যাই।'

মলিমা তাহার হাতে-পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'না মা, তুমি আজকার দিনটি থাকো।'

সুরমা কিন্তু থাকিল না। তাহার ইচ্ছা নয় যে, সরোজ রাগের মাথায় তাহার কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে; শ্যামসুন্দরকে অপমান যেন না করে। সেই কথাই মলিনাকে ভাল করিয়া

বুঝাইয়া সুরমা বলিল, 'বেশ ত' মা, তোকে দেখলাম, তোর মেয়েকে দেখলাম, এবার যাই মা। কেলেঙ্কারীর চেয়ে ঢের ভালো।'

মলিনা কাঁদিতে লাগিল।

শ্যামসুন্দর গ্রামের মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছিল।

ফিরিয়া আসিয়াই শুনিল—যাইবার কথা।

শুনিয়া ভাল করিয়া ভিতরের ব্যাপার বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিলেও একটা যে কিছু হইয়াছে নিশ্চয়ই তাহা বুঝিল।

মলিনার কাছে বিদায় লইতে গিয়া দেখিল, মলিনা কাঁদিতেছে।

কান্না ছাড়া মুখে আর কোনও কথা নাই।

সেই মলিনা!

সেই অপরূপ রূপ লাবণ্যময়ী সুন্দরী মলিনা!

এখনও ঠিক তেম্‌নিটিই আছে।

শ্যামসুন্দরের মুখের পানে বড় সকরুণ দৃষ্টিতে মলিনা একটিবার মাত্র তাকাইল। ধীরে-ধীরে বলিল, সবই ত' জানো।'

বলিয়া হেঁট হইয়া তাহাকে একটি প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

রাত্রির অন্ধকার বলিয়া রক্ষা। শ্যামসুন্দরের চোখ দুইটাও জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। তাহাই সে অতিকষ্টে গোপন করিয়া ধীরে-ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মলিনার এবার যে চিঠিগুলি আসিতে লাগিল তাহা সত্যই বড় করুণ!

শ্যামসুন্দর সুরমাকে বলে সে ভাল আছে, কিন্তু নিজে সে দিবারাত্রি ভাবিতে থাকে—কেমন করিয়া মলিনাকে সে এই অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে।

অত্যাচার নয় ত' কি!

যে-সব কথা সে লিখিয়াছে কোনোদিন তাহা সে লেখে না। পড়িলে চোখে জল আসে।

শ্যামসুন্দর সেই চিন্তাতেই দিনকতক বিভোর হইয়াছিল, হঠাৎ সে চিন্তায় তাহার বাধা পড়িল।

গ্রামে বড় সাংঘাতিক রকম কলেরা সুরু হইল।

প্রথমে গরীব লোকদের আরম্ভ হইয়াছিল, এইবার ভদ্রলোকদের ধরিল।

লোকে বলিতে লাগিল এমন সাংঘাতিক ব্যারাম এ অঞ্চলে কখনও হয় নাই। যাহাকে একবার ধরিতেছিল সে আর উঠিতে পারিতেছিল না। গ্রামের বহুলোক মরিয়া গেল।

বংশলোচনবাবু শ্যামসুন্দরকে ডাকিয়া বলিলেন, 'একটু সাবধানে থাকিস বাবা। আর লোকজনকে একটু দেখাশোনা করিস।

কিন্তু সে কথা বলিবার আগেই শ্যামসুন্দর তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিল। শহর হইতে একজন ডাক্তার আনাইয়া নিজের

খরচে তাহাকে বারোয়ারিতলায় একখানা ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিল। কাহারও কলেরা হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিজে ডাক্তার লইয়া সেখানে গিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছিল।

লোকজনের মুখে মুখে শ্যামসুন্দরের যশ আর ধরে না!

এমনি করিতে করিতে শ্যামসুন্দর নিজেই একদিন বিপদে পড়িল।

রাণীমার কলেরা হইল।

কলেরা হইল সকালে, ডাক্তার আসিল, ঔষধ দিল, ইঞ্জেক্‌সান্ করা হইল, সকলে হায় হায় করিতে লাগিল, এবং তিনি মারা গেলেন বৈকালে।

বংশলোচনবাবু কাঁদিতে লাগিলেন। চেয়ারে করিয়া তুলিয়া তাঁহাকে মৃতদেহের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে, পঙ্গু হইয়া তিনি নিজে অনর্থক বাঁচিয়া রহিলেন কেন, ইহার চেয়ে তিনি নিজে মরিলেই ভাল হইত।

শ্যামসুন্দর কাঁদিতে লাগিল।

সুরমা কাঁদিতে লাগিল।

আর জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ খোকা শুধু হাঁ করিয়া ইহার-উহার মুখের পানে মিট্ মিট্ করিয়া তাকাইতে লাগিল।

সংসারে সুরমা একা। তাহাকেই সবদিক দেখাশোনা করিতে হয়। রান্নার বাঁটনা বাঁটা, বাসন মাজা হইতে আরম্ভ করিয়া বংশলোচনবাবুর সেবা শুশ্রূষা, খোকাকে দুধ খাওয়ানো, কাঁদিলে চুপ করানো, ঘুম পাড়ানো—সবই এখন তাহার হাতে।

আয় এখন দস্তুরমত কম। বংশলোচনবাবুর কাছে একজন মাত্র চাকর ছাড়া অন্যান্য দাসদাসী সকলেই বিদায় লইয়াছে।

কর্ম্মচারী বিনোদকেই জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখিতে হয়। সংসারের ফাই-ফরমাস সে-ই খাটে।

দশদিনের দিন রাণী-মার শ্রাদ্ধ। পরের দিন ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজনও যৎসামান্য না করিলে নয়।

সুরমাকে কাছে ডাকিয়া সেদিন শ্যামসুন্দর বলিল, 'তাহ'লে বামুনের মেয়ে একজন রাখি, নইলে সবদিক সামলানো আপনার একার পক্ষে অসম্ভব।'

সুরমা বলিল, 'না বাবা আর খরচ বাড়াতে হবে না। আমি একাই পারব।'

বলিয়া একটুখানি হাসিয়া আবার বলিল, 'শ্রাদ্ধের দিন পাড়ার মেয়েদের আমি ডেকে আনব। ব্রাহ্মণ-ভোজনের দিন ত' বা'র-বাড়ীতে ব্যাটাছেলেরাই সব দেখা শোনা করবে। মাইনে দিয়ে অনর্থক লোক রাখবার দরকার আর হবে না বাবা।'

লোক সে কিছুতেই রাখিতে দিল না। মনে মনে বলিল, 'নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ে যে উপকার তুমি করেছ, তোমার সে ঋণ আমায় শোধ করতে দাও।'

কিন্তু শ্রাদ্ধের দিন অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া সুরমা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

পরদিন ব্রাহ্মণ ভোজন।

গ্রামের চারিদিকে কলেরা তখনও চলিতেছে। শ্যামসুন্দরের ইচ্ছা—ব্রাহ্মণ ভোজন এখন বন্ধ থাক। ব্যারাম থামিলে বরং বেশ ঘটা করিয়াই আয়োজন করিবে।

শুধু সেই কারণেই শ্রাদ্ধের দিন সন্ধ্যায় শ্যামসুন্দর গ্রামের কয়েকজন লোককে ডাকিয়া পাঠাইল।

বাহিরের ঘরে মজলিস বসিয়াছে। বংশলোচনবাবু মজলিসের একপাশে আরাম-কেদারায় শুইয়া আছেন।

মুণ্ডিত মস্তক শ্যামসুন্দর করজোড়ে সকলের কাছে সবিনয় তাহার প্রার্থনা জানাইল।

দু'জন রাজি হইল। বলিল, 'ভাল কথা। বেশত' এ সময় চারিদিকে রোগ-বেয়াধি, তার চেয়ে বরং তোমার যখন খুশী...'

বৃদ্ধ চণ্ডিদাস আগাইয়া আসিলেন। বলিলেন, 'ও। এই জন্যেই বুঝি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলে? কিন্তু হ্যাঁ বাবা শ্যামসুন্দর, তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ হয়ে এ কথাটা বললে কেমন করে' ?—ব্রাহ্মণ ভোজন না করালে আত্মার সদ্‌গতি হয় না যে!'

যাঁহারা রাজি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, 'আহা তুমি ভুল বুঝছ চণ্ডিদা, ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন না—সেকথা ত' বলেননি উনি। বলছেন, দুদিন পরে হলেই ভাল হয়।

ঘাড় নাড়িয়া চণ্ডিদাস বলিলেন, ‘বুঝেছি। অবস্থা বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়—তাও জানি। হাতে পয়সা কড়ি লাট-বেলা-টেরও সব সময় থাকে না, কিন্তু এ যে মাতৃদায়, গৃহশুদ্ধি করবার জন্যেও যে ঘর-পিছু একজন করে’ বলতেই হবে। মড়াটা কাঁধে করে’ যারা শ্মশানে গিয়েছিল—বলি, তাদের বলতে হবে কি না?’

‘তুমি উল্‌টো বুঝছ চণ্ডিদা, আসল কথা হচ্ছে গিয়ে—’

চণ্ডিদাস লাফাইয়া উঠিলেন,—‘আরে তুই দুদিনের ছেলে তুই আর আমায় উল্টো বোঝার কথা বলিসনি, তুই চুপ কর্। বলি—শ্মশান বন্ধুদের খাওয়াতে হবে কিনা সেই কথাই জিজ্ঞেস্ করছি। হবে কিনা তাই বল্!’

‘হ্যাঁ হবে।’

তক্তাপোষের উপর এক চাপড় মারিয়া চণ্ডিদাস বলিলেন, ‘বাস্! এইবার পথে আয়!—বলি, তাদের বুঝি কলেরার ভয় নেই? ভয় শুধু আমাদের বেলায়! কেমন?’

‘না না তা নয়। তা নয়।’

‘নয় কেন, বলি—নয় কেন? বাড়ীতে খাস্‌নে? গাঁয়ে কলেরা হচ্ছে বলে’ বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ করে’ বুঝি হাত গুটিয়ে দাঁত বের করে’ বসে’ আছিস? না? যত সব বুজ্‌রুকি শুন্‌লে আমার গা জ্বালা করে।—না শ্যামসুন্দর, তুমি কারও কথা শুনো না, এই সময় হাতে হাতে তুমি যেমন পার সেরে’ দাও, ফেলে রাখলেই বিস্তর খরচ—তখন সে আবার পঞ্চগ্রামী নবগ্রামীর হ্যাঙ্গামায় পড়ে যাবে। বুঝলে?’

যাই হোক, এই কথা বলিবার পর উপস্থিত অন্যান্য সকলের মত লইয়া দেখা গেল, প্রথমে যে দু'জন 'না' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহারা ছাড়া বাকি সকলেরই ইচ্ছা—এই সঙ্গে ব্রাহ্মণ ভোজন চুকিয়া যাওয়াই ভালো।

আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত

সেই রাত্রেই লোকজন ডাকিয়া বাহির-বাড়ীর চত্বরে বড় বড় উনান তৈরি করিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইল।

সকাল হইতে তখন আর বেশি বিলম্ব নাই। লুচি প্রায় সবই ছাঁকা হইয়া গেছে। ওদিককার কয়েকটা কড়াইএ সন্দেশের পাক চড়িয়াছে। এমন সময় ভিতর বাড়ী হইতে খবর আসিল—সুরমার ভেদ-বমি সুরু হইয়াছে।

ডাক্তার গ্রামেই ছিলেন। তৎক্ষণাৎ আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

শ্যামসুন্দর একেবারে পাগলের মত রুদ্ধশ্বাসে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। হাত জোড় করিয়া ছলছল চোখে বলিল, 'আপনারা সব দেখে শুনে নেবেন দাদা, আমায় এক্ষুণি বেলডাঙ্গা যেতে হচ্ছে।'

চারিদিক হইতে প্রশ্ন উঠিল, 'কেন? কেন?'

'মলিনাকে আনতে। যাঁর কলেরা হয়েছে তার মেয়ে।'

সকলেই বলিল, 'তুমি কেন ? তুমি নিজে না গিয়ে অন্য লোক পাঠিয়ে দিলেই ত' চলে।'

শ্যামসুন্দর ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, 'না তা চলে না ভাই। তাহলে পাঠাবে না।'

বলিয়াই চোখের জল মুছিয়া একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া নিতান্ত অসহায় ভাবে বলিল, 'বাড়ীতে আমার মেয়েছেলে কেউ নেই ভাই, তোমরা যদি দয়া করে' কেউ আমার ছেলেটাকে এখান থেকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাও ত'—'

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আর সে বলিতে পারিল না, সেখানে অপেক্ষা করিবার অবসরও আর তাহার ছিল না, ভোর সাড়ে-পাঁচটায় ট্রেণ, তাড়াতাড়ি তেমনি অবস্থাতেই খালি পায়ে খালি গায়ে সেখান হইতে সে চলিয়া গিয়া একরকম ঊর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশনের দিকে ছুটিতে লাগিল।

শ্যামসুন্দরের ওইরূপ অবস্থা দেখিয়া মলিনার বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। ভাবিয়াছিল, শয্যাশায়ী রুগ্ন পিতা হয়ত তাহার মারা গিয়াছেন। কিন্তু শ্যামসুন্দরের মুখে রাণী-মার মৃত্যু সংবাদে মলিনার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

শ্যামসুন্দর বলিল, 'তোমায় যেতে হবে মলিনা—এক্ষুণি। তোমাকে নিতেই আমি এসেছি।'

'আমাকে ? যেতে হবে ?' বলিয়া সজল চক্ষে মলিনা তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।—'কিন্তু দেবে ত' যেতে ?'

'যেতেই হবে মলিনা, তুমি সাজো। তোমার মা'র...কলেরা হয়েছে।'

অতিকষ্টে কথা কয়টা বলিয়া শ্যামসুন্দর সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

'আমার মা'র ? হায়, হায়, দেখতে পাব ত ? আমি যে মাকে সেদিন জোর করে' তাড়িয়ে দিয়েছি বাড়ী থেকে !' বলিতে বলিতে মলিনার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'চল যাই।'

এমন সময় সরোজ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। শ্যামসুন্দরের মুখের পানে অবাক হইয়া তাকাইয়া বলিল, 'কে ?'

'আমি শ্যামসুন্দর।'

এতক্ষণে তাহাকে সে চিনিতে পারিল। বলিল, 'ও। তা আপনি কেন এলেন ? আপনাকে না আমার বাড়ী ঢুকতে বারণ করেছিলাম ?'

একথার জবাব শ্যামসুন্দর দিল না। দিল—মলিনা।

সে তখন কাঁদিতে কাঁদিতে মেয়েকে কোলে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সরোজকে বলিল, 'একটা লোক ডেকে দাও, মার কলেরা হয়েছে, আমি চললাম।'

সরোজ হাসিল। বলিল, 'হ্যাঁ মতলব মন্দ নয়। এবার ঠিক ফন্দী এঁটেছ। কলেরা না হ'লে ত' তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া চলে

না। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। তুমি যাও আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে।' বলিয়া শ্যামসুন্দরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সরোজ তাহাকে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

শ্যামসুন্দর বলিল, 'যাব না। আমি ওকে নিয়ে তবে এখান থেকে উঠব।'

সরোজ বলিল, 'তোমাকে না তাড়িয়ে আমি জলগ্রহণ করব না।'

এমনি করিয়া কথায় কথায় দারুণ বচসা!

শ্যামসুন্দরের প্রতিজ্ঞা নলিনাকে সে আজ লইয়া যাইবেই।

সরোজ অনেক কথাই বলিল। বলিল, 'আমি জানি ওরা মা ও মেয়ে দু'জনেরই স্বভাব চরিত্র ভাল নয়। তবু যখন দেখলাম—আহা পরের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিলে, তখন ভাবলাম, মেয়েটাকে নিয়ে আসি, দেশে-বিদেশে আমার মুখ পোড়ানোর চেয়ে ঢের ভালো। কিন্তু এখানে এসেও রক্ষে নেই।'

শ্যামসুন্দরের আর অপেক্ষা সহিতেছিল না। সরোজের কাছে আগাইয়া গিয়া তাহার হাতে ধরিয়া বলিল, 'আপনার হাতে ধরে' বলছি—আমি মিথ্যা বলিনি। ওকে যেতে দিন আমার সঙ্গে ওর মাকে হয়ত সে আর একবারটি শেষ দেখাও দেখতে পাবে না। বিশ্বাস না হয়—আপনি নিজে চলুন।'

সরোজ হাসিল।—'আমি নিজে? তোমার বাড়ী? তোমার সেই বাপের—সেই বংশলোচনবাবু না কী—সেই তার বাড়ী? আমি যাব?' বলিয়া এমন একটা কদর্য্য কথা সে মুখ দিয়া বাহির করিল যাহা শুনিলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

শ্যামসুন্দর আর সহ্য করিতে পারিল না। মলিনাকে বলিল, 'এসো মলিনা, তোমার মেয়েকে নিয়ে তুমি বেরিয়ে এসো। এই জানোয়ারটার অপমান অত্যাচার সহ্য করে' তোমার সতী নাম কেনার চেয়ে—এসো তুমি !'

বলিয়া শ্যামসুন্দর রুখিয়া দাঁড়াইল।

মলিনাও তৎক্ষণাৎ তাহার মেয়েকে কোলে লইয়া আগাইয়া আসিতেছিল।

সরোজ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার পেটের উপর মারিল এক লাথি। ছোট মেয়েটাকে কোলে লইয়াই সে উল্টাইয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে 'মাগো !' বলিয়া চীৎকার করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। মেয়েটা কাঁদিয়া উঠিল।

এ অত্যাচার শ্যামসুন্দর আর চোখে দেখিতে পারিল না। সরোজের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে তাহার গলাটা দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল।

সরোজও ছাড়িবার পাত্র নয়। পাশেই পড়িয়াছিল একটা লুচি বেলিবার চাকি-বেলুন। বেলুনিটা সে হাতড়াইয়া পাইল না, কাজেই চাকিটা তুলিয়া লইয়াই শ্যামসুন্দরের কেশ বিরল মস্তকের উপর সে এত জোরে আঘাত করিল যে, মাথাটা ফাটিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

মলিনা আর এ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রন্দনরতা মেয়েটাকে তাহার কোল হইতে নামাইয়া দিয়া ছুটিয়া সে তাহাদের দুজনের মাঝখানে পড়িয়া দু'জনকেই ছাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

শ্যামসুন্দর ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু রাগের মাথায় কি যে করিবে ভাবিয়া না পাইয়া কপালের পাশে রক্তের ধারাটা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের কোণ হইতে পিতলের একটা পিল্‌সুজ্‌ তুলিয়া লইয়া সরোজকে মারিতে যাইতেছিল, মলিনা টপ্‌ করিয়া তাহার উদ্যত হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, 'থাক্‌। চল আমরা যাই।' বলিয়া মেয়েটাকে আবার তাহার কোলের উপর তুলিয়া লইয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

শ্যামসুন্দর পিল্‌সুজ্‌টা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'চল।'

সরোজ বলিল, 'একেবারেই যাচ্ছিস মনে থাকে যেন হারামজাদী, তোর মুখ আমায় যেন আর না দেখতে হয়।'

বলিয়া খুব জোরে জোরে চেঁচাইতে চেঁচাইতে সরোজ তাহার স্ত্রীর উদ্দেশে যে-সব বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল তাহা যেমন বিশ্রী তেমনি অশ্রাব্য।

মলিনা এক-কাপড়ে এক-জামায় বাক্স-প্যাঁট্‌রা কিছুই না লইয়া শ্যামসুন্দরের সঙ্গে হাঁটিতে হাঁটিতে ষ্টেশনে চলিল।

সরোজের বাড়ী গ্রামের একেবারে একটেরে। এত গোলমাল এত হট্টগোল—তবু কেহ কিছু শুনিতে পায় নাই। এইবার কিন্তু তাহার এই গালাগালি চীৎকারে লোক জড়ো হইতে লাগিল।

মলিনাকে লইয়া শ্যামসুন্দর যখন বাড়ী ফিরিল তখন বেলা প্রায় পাঁচটা।

চারিদিক সুম্‌শান্‌! লোকজন কেহ কোথাও নাই।

সদর ফটক পার হইয়া সিঁড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, গ্রামের একটি মেয়ে সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে।

শ্যামসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছেন?'

মেয়েটি বলিল, 'নেই বাছা।' বলিয়া সে তাহার চোখে কাপড় চাপা দিয়া বোধ করি কাঁদিবার চেষ্টা করিতেছিল।

মলিনার হাতে ধরিয়া শ্যামসুন্দর তাড়াতাড়ি তাহাকে উপরে লইয়া গেল।

উপরে গিয়া দেখে, চারিদিকে লোকজনের ছড়াছড়ি। মেঝের মাঝখানে আপাদমস্তক সাদা কাপড়-ঢাকা সুরমার মৃতদেহ।

মলিনা তাহার মেয়েকে কোল হইতে তাড়াতাড়ি নামাইয়া দিয়া মায়ের মৃতদেহের উপর কাঁদিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল।—'ও মাগো! আমার যে আর কেউ নেই গো! তোমাকে যে আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম মাগো! আমায় তুমি যে একটিবার দেখা না দিয়েই চলে গেলে গো!'

মলিনার মেয়ে মণিও কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিলে চলে না।

মৃতদেহের সৎকার করিতে হইবে।

শ্যামসুন্দর তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

তাহার ছেলে মাণিককে কোথাও দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মাণিক কোথায়?'

কে একটি মেয়ে বলিল, 'প্রকাশের স্ত্রী অপরাজিতা নিয়ে গেছে।'

নামটা প্রথমে শ্যামসুন্দরের কাছে বিশেষ পরিচিত বলিয়া মনে হইল না। জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রকাশ কে?'

বলিল, 'ও-পাড়ার সেই প্রকাশ। সেই যে থিয়েটারে বক্তৃতা করতো।'

শ্যামসুন্দর এতক্ষণে চিনিতে পারিয়া বলিল, 'ও।'

তাহার পর লোকজন ডাকিয়া সুরমার মৃতদেহের সৎকার করিয়া আসিয়া মলিনাকে বুঝাইতে বসিল।

বাড়ীতে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নাই,—আহারাদির ব্যবস্থা কে যে করিবে তাহার স্থিরতা নাই। বাড়ীতে দুধ নাই, মলিনার মেয়েটি কি যে খাইবে কে জানে। শ্যামসুন্দরের চোখের সুমুখে সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিলেও চলিবে না। লোকের সন্ধানে শ্যামসুন্দর ঘরের বাহিরে আসিয়া কোথায় যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় দেখিল, প্রকাশ আসিতেছে।

শ্যামসুন্দর বলিল, 'এসো।'

প্রকাশ বলিল, 'হ্যাঁ এলাম ভাই মাণিকের কথা বলতে।

ভাবলাম হয়ত ভাববে। আমার স্ত্রী তাই বার-বার করে' পাঠিয়ে দিলে। মাণিক বেশ ভাল আছে। কাঁদেনি। ভেবো না।'

মাণিক—শ্যামসুন্দরের ছেলের নাম।

শ্যামসুন্দর বলিল, 'না ভাই, মাণিকের জন্যে ভাবিনি। ভাবছি—'

বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভাবছ?'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'বড় বিপদে পড়েছি ভাই। বাড়ীতে কেউ নেই। মলিনা এসেছে। মলিনার ছোট একটি মেয়ে। কে যে তাদের দেখাশোনা করে তাই ভাবছি।

প্রকাশ বলিল, 'তা সত্যি, ভাবনাই বটে।'

বলিয়া সেও চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু এমন চুপ করিয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। মলিনার মা মরিয়াছে, সংসারে তাহার আপনার বলিতে আর কেহ নাই, সে হয়ত' উপবাস করিয়া পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে পারিবে, কিন্তু ওই যে বছর-দেড়েকের ছোট মেয়েটা, সে কিছু বুঝে না, জানে না, ক্ষুধা পাইলে বলিতে পারে না—তাহার একটা ব্যবস্থা করা যে একান্ত প্রয়োজন। একবার ভাবিল, প্রকাশের হাতে ধরিয়া বলে, মাণিককে যেমন তুমি লইয়া গিয়াছ ভাই, তেমনি যদি মণিকে লইয়া যাও ত' আমি বাঁচি।

মনে মনে ভাবিল বটে, কিন্তু বলিতে পারিল না। মনে হইল, মানুষ যদি কাহারও উপর একটুখানি দয়া প্রকাশ করিয়াছে,

সেই দয়ার উপর জুলুমের মত পাপ বোধ করি আর দুনিয়ায় কিছু নাই।

শ্যামসুন্দর বলিল, 'আচ্ছা, সেই মুখুজ্যে পাড়ার সুধীরের দিদিকে যেন দেখলাম সেদিন হাটতলা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটি নসিবপুরের বাবুদের বাড়ী ভাত রাঁধতো,—না?'

প্রকাশ বলিল, 'হ্যাঁ, ওকে এনে' রাখলে হয়। বাবুদের বাড়ী ভাত-রাঁধা চাকরি তার গেছে শুনলাম।'

শ্যামসুন্দর আর বিলম্ব না করিয়া মুখুজ্যে-পাড়ার দিকে নিজেই চলিতে লাগিল।

প্রকাশ বলিল, 'আমিও যাই তোমার সঙ্গে। চল।'

শ্যামসুন্দর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না। আমি একা যাব।'

বলিয়া প্রকাশের হাতে ধরিয়া তাহাকে একটুখানি কাছে টানিয়া আনিয়া শ্যামসুন্দর তাহার ট্যাক হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া চুপি চুপি বলিল, 'এই টাকা ক'টি তুমি নিয়ে যাও প্রকাশ। ছেলেটা আছে। দুধ-টুধ...'

'পাগল! এ আমি নেব না, কিছুতেই।' বলিয়া প্রকাশ সরিয়া দাঁড়াইল। টাকা সে কিছুতেই লইতে চাহিল না।

শ্যামসুন্দরও ছাড়িবে না, প্রকাশও লইবে না।

অবশেষে শ্যামসুন্দরেরই জিৎ হইল।

বলিল, 'না নিলে বুঝব তুমি আমার টাকা নিতে ঘৃণা বোধ কর।'

তখন আর প্রকাশ কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। টাকা-

পাঁচটি হাতে লইয়া অপরাজিতাকে তাড়াতাড়ি সেই কথা বলিবার জন্য বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

সুধীরের দিদি চাকরির চেষ্টায় আবার কোন্ এক গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে পাওয়া গেল না। সুধীর ছেলেটি যেমন গরীব, তেমনি অমায়িক। হাত দুইটি জোড় করিয়া বলিল, 'আমি যাব?'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'না ভাই, তোমায় যেতে হবে না।'

শ্যামসুন্দর আরও দু-একজনের বাড়ী গেল বটে, কিন্তু গেল আর ফিরিয়া আসিল, আসল কথাটা কাহাকেও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না।

এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রে যখন সে একাকী বাড়ী ফিরিয়া আসিল মুখখানি তাহার শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেছে। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। এক গ্লাস জলও কোথাও কাহারও বাড়ীতে চাহিয়া খাইতে পারে নাই।

বাড়ীতে জল আছে কিনা তাই বা কে জানে।

বংশলোচনবাবুর কাছে যে-চাকরটা আছে, জল তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া বাবুর যাবতীয় কাজ আজকাল সে-ই করে। তাঁহার ঘরে জল এক গ্লাস হয়ত সে পাইতে পারে ভাবিয়া শ্যামসুন্দর তাহার পিতার কক্ষের দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই অবাক্

হইয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিল, মেঝের উপর কে একটি মেয়ে যেন পিছন ফিরিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া দুধ গরম করিতেছে। এবং শ্রীপতি চাকরটা টেবিলের উপর আলো রাখিয়া তাহারই পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বংশলোচনবাবু শুইয়া শুইয়া কি একটা বই পড়িতেছিলেন, পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিলেন, শ্যামসুন্দর। বলিলেন, 'আয়! ছাখ্ কে এসেছে ছাখ্! আমার মা।'

মা যে কে শ্যামসুন্দর তাহা বুঝিতে পারিল না। পিছন ফিরিয়া ছিল বলিয়া প্রথমে সে ভাবিয়াছিল—মলিনাই বুঝি-বা উঠিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মেয়েটি একবার তাহার দিকে চট্ করিয়া মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া লইল।

শ্যামসুন্দর দেখিল, মলিনা নয়, এবং ইহাকে সে জীবনে কোনোদিন দেখিয়াছে বলিয়াও মনে হইল না।

শ্যামসুন্দর অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বংশলোচনবাবু বলিলেন, 'প্রকাশের স্ত্রী। প্রকাশ দিয়ে গেল। বাড়ীতে আমার দেখাশোনা করবার লোকজন কেউ নেই দেখে মা আমার নিজেই এসেছেন।'

শ্যামসুন্দরের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িল বই কমিল না। কিয়ৎক্ষণ তেমনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শ্রীপতিকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, 'এক গ্লাস জল দিতে পারিস বাবা!'

শ্রীপতি জল আনিয়া দিতেই শ্যামসুন্দর জল খাইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখে, মলিনা উঠিয়া বসিয়াছে।

এবং যে-ঘরে তাহার মা মরিয়াছে, যে-ঘরে সে এতক্ষণ পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল, সে ঘরটা ফিনাইল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ধূপ জ্বালিয়া, পাশের আর-একটা ঘরের মেঝের উপর বসিয়া বসিয়া একধারে মণি ও একধারে মাণিক—দু'পাশে দুজনকে বসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে খেলা করিতেছে।

শ্যামসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রকাশের স্ত্রী বুঝি মাণিককে নিয়ে এলো?'

মলিনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ। আহা, চমৎকার মেয়ে।'

চমৎকার—শ্যামসুন্দর তাহা একবার দেখিয়াই বুঝিয়াছে।

মলিনা একটুখানি সুস্থ হইয়াছে দেখিয়া শ্যামসুন্দর তাহার সহিত কথা বলিতেছিল, এমন সময় গরম দুধের বাটি বাঁ হাতে কাপড়ের উপর বসাইয়া অপরাজিতা আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্যামসুন্দর একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইতেছিল, কিন্তু ও-সব মিথ্যা লৌকিকতা অপরাজিতার ভাল লাগে না। মলিনার কাছে গিয়া হাত হইতে বাটিটা নামাইয়া বলিল, 'কই, ঝিনুক দাও ত' ভাই, এ দুটোকে খাওয়াই আগে, তারপর তোমাদের ব্যবস্থা।'

মলিনা বলিল, 'আমাদের সে কাপড়ের পুঁটুলিটা......'

বলিয়া সে এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল।

অপরাজিতা বলিল, 'তাকানো নয়, ওঠো ভাই ওঠো!

যে-জিনিষের ওপর মানুষের হাত নেই তার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা অনুতাপ করা বৃথা। নে ভাই, ওঠ্, তাড়াতাড়ি খাইয়ে নিই।'

মলিনাকে উঠিতে হইল।

কিন্তু শোক—তা সে যত বড়ই হোক্, মানুষ তাহাকে ভুলিবেই। না ভুলিলে তাহার বাঁচা অসম্ভব।

মলিনাও তাহার মায়ের শোক ভুলিল।

তিন দিনের দিন মেয়ের শ্রাদ্ধের অধিকার। মলিনা তাহাই করিল।

শ্যামসুন্দর বলিল, 'হ্যাঁগা, সরোজকে একটা খবর দেওয়া ত' উচিত।'

মলিনা বলিল, 'মিছেমিছি।'

'না তাহ'লেও—'

মলিনা বলিল, 'ওর বাড়ী আমি আর যাব না।'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'নালিশ ক'রে' যদি আমার নামে দোষ দিয়ে জোর ক'রে' নিয়ে যেতে চায়?'

মলিনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'তাহলেও না। আদালতে বলব —আমি স্বেচ্ছায় এসেছি। আমি দুশ্চরিত্রা।'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'ছি! আদালতে তাই কি বলতে আছে নাকি?'

মলিনা বলিল, 'কেন নেই? ও স্বামীর হাত থেকে আমি নিষ্কৃতি চাই। পাপ—যত-কিছু গোপনে করতে আছে, প্রকাশ্যে বল্‌তে নেই; না? আমি বলব।'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'বেশ তাই বোলো, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমি করি। আমি তার শ্বাশুড়ীর শ্রাদ্ধে একটা নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠাই।'

সত্যই নিমন্ত্রণের চিঠি লইয়া লোক গেল।

বৈকালে নিশ্চয়ই তাহার আসিবার কথা। শ্যামসুন্দর অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় লোক ফিরিয়া আসিল।

বলিল, 'চিঠিখানা ছিড়ে খণ্ড খণ্ড করে' ফেলে দিয়ে তেড়ে আমায় মারতে উঠলেন তিনি।'

যাই হোক, সরোজ আসিল না।

তখন আসিল না বটে. কিন্তু তিন চারদিন পরেই সরোজের কাছ হইতে শ্যামসুন্দরের নামে এক আসামীর শমন আসিয়া হাজির হইল।

কিসের আসামী, কিসের মোকদ্দমা শ্যামসুন্দর তাহা বুঝিল, কিন্তু বুঝিয়াই বা উপায় কি! আদালতে হাজির তাহাকে হইতেই হইবে।

শমন লইয়া শ্যামসুন্দর মলিনার কাছে গেল।

'কি করা যায় মলিনা?'

মলিনা বলিল, 'আমায় সাক্ষী মেনো। আমি সাক্ষী দেব।'

শ্যামসুন্দর বলিল, 'ছি ছি, সেটা কি উচিত?'

মলিনা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, নিশ্চয়ই উচিত। যাই হোক, উচিত-অনুচিত সে-সব আমি বুঝব। আমি ছাড়া তোমার আর উপায়ই-বা কি! ও ওইরকমই লোক! তা হোক, ভেবো না, আমি উকিলের মেয়ে।'

শ্যামসুন্দর তাহার বাবার কাছে পরামর্শ চাহিল। বংশলোচন-বাবু একটুখানি হাসিলেন। এত কাণ্ড যে ঘটিয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না।—অদৃষ্টের পরিহাস আর কাহাকে বলে!

হা ভগবান! তিনি শুধু বাঁচিয়া রহিলেন এই-সব দেখিবার জন্য। নিজের কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত তিনি নিজে করিতেছেন, আবার পুত্রও কি তাহার সেই রক্তের ঋণ পরিশোধ করিবে নাকি!

বংশলোচনবাবু বলিলেন, 'যাও উকিলের কাছে। গিয়ে ভাল করে' বুঝে এসো।'

উকিল আশ্বাস দিলেন। তবে মলিনাকে যে সাক্ষী মানিতে হইবে সে কথা তিনিও বলিলেন।

মোকর্দ্দমার দিন আসিল। সরোজ বাকি কিছুই রাখে নাই। আট-ঘাট বাঁধিয়াই সে আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রথম দিন একটুখানি শুনানী হইয়াই আদালত বন্ধ হইয়া গেল। সরোজ তাহার পাড়া-প্রতিবেশী কয়েকজন সাক্ষী ডাকিয়া

লইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দু'জন যাহা বলিল, তাহা একেবারে মিথ্যা। বলিল, তাহারা নাকি শ্যামসুন্দরকে মাসের মধ্যে অন্তত দশদিন সরোজের বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে।

সরোজের উকিল বলিলেন, 'আরও প্রমাণ আছে হুজুর।'

বলিয়া পকেট হইতে তাঁহার একতাড়া চিঠি বাহির করিয়া টেবিলের উপর নামাইলেন।

চিঠিগুলি শ্যামসুন্দরের হাতের লেখা এবং লেখা হইয়াছে সরোজের স্ত্রী মলিনাকে।

উকিল বলিলেন, 'চিঠির মধ্যে সরোজকে খুন করিবার কথা যদিও স্পষ্ট কোথাও লেখা হয় নাই, তবু এটা ঠিক যে—শ্যামসুন্দরের মনে ওই এক খুন করিয়া মলিনাকে লইয়া পালানো ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।'

বলিয়া একটুখানি থামিয়া তিনি সরোজের মুখের পানে তাকাইয়া আবার একটা ঢোঁক গিলিয়া হাকিমের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'তা ছাড়া আসামীর বংশ পরিচয় মোটেই ভাল নয়। আসামীর পিতা বংশলোচনবাবুর নামে চার-পাঁচটি মেয়ে আদালতে নালিশ করিয়া তাঁহার কাছে খোরপোষ আদায় করিয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।' মুখে তিনি বলিতে আর বাকি কিছু রাখিলেন না।

এদিকে শ্যামসুন্দর সাক্ষী মানিল মলিনাকে।

সরোজ ভাবিয়াছিল, প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়াইয়া মলিনা তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য কখনই দিবে না। কিন্তু তাহার সে বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া দিয়া মলিনা গিয়া সাক্ষীর কাঠ-গোড়ায় দাঁড়াইয়া যে-সব কথা উচ্চারণ করিল, তাহা শুনিয়া সরোজ ত বিস্মিত হইলই, এমনকি শ্যামসুন্দরও চমকিয়া উঠিল।

ফলে হইল এই যে, বিস্তর টাকা খরচ করিয়া প্রায় তিন মাস ধরিয়া মোকর্দ্দমা চলিবার পর শ্যামসুন্দর মুক্তি পাইল। এবং সরোজ তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ করিয়া বৌ ঘরে আনিল।

মলিনা তাহার মেয়ে মণিকে লইয়া রহিয়া গেল শ্যামসুন্দরের কাছেই। সরোজের বাড়ী হইতে সেই যে সে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সেই আসাই তাহার শেষ আসা হইল।

মণি ও মাণিক এক সঙ্গে বড় হইতে থাকে।

শ্যামসুন্দর দেখে।

মলিনা হাসে।

বলে, 'কেমন মানিয়েছে দেখেছ?'

শ্যামসুন্দর বলে, 'ওদের বিয়ে দিলে কেমন হয়?'

মলিনা বলে, 'মন্দ হয় না, কিন্তু—'

'কিন্তু কি— ?'

মলিনা বংশলোচনবাবুর ঘরের দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া বলে, 'রাজি হবেন ত ?'

শ্যামসুন্দর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, 'বিয়ের যখন বয়েস ওদের হবে ততদিন কি আর উনি বাঁচবেন ভেবেছ ?'

মলিনা হাসে। বলে, 'বাঁচবেন বই-কি! নিজের কীর্ত্তি ত' দেখেছেন, তোমার দেখলেন, আবার নাতির দেখবেন না ? তা যদি না দেখেন ত' বৃথাই জীবন !'

শ্যামসুন্দর মৃদু একটুখানি হাসিয়া তাহার জবাব দেয়।

মলিনা এক-এক সময় মণি ও মাণিককে কাছে ডাকিয়া মাণিককে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে একে তুই বিয়ে করবি ?'

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'হুঁ।'

মণি বলে, 'হ্যাঁমা, কোল্‌বো।'

শ্যামসুন্দরকে ডাকিয়া মলিনা তাহাদের এই মজার কথা শোনায় আর হাসে।

অনেকদিন পরের কথা।

মণি ও মাণিক বেশ বড় হইয়াছে। তাহাদের দেখিলে আর চিনিবার উপায় নাই।

মাণিকের সঙ্গে মণির বিবাহের প্রস্তাব শ্যামসুন্দর

তাহার বাবার কাছে করিয়াছিল বটে, কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই।

বংশলোচনবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছেন, 'না তা হয় না শ্যামসুন্দর। আমাদের এত বড় বংশগৌরব নষ্ট করে' ওই একটা—'

আর কিছু তিনি বলিতে পারেন নাই। বরং যাহোক্ করিয়া তাড়াতাড়ি মণির একটা বিবাহ দিয়া তাহাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিবার কথাই বলিয়াছিলেন।

এবং তাহাই হইল।

রামচন্দ্রপুরের এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে তেরো বছরের মণির বিবাহ হইয়া গেল।

কিন্তু হইলে কি হইবে। মণির অদৃষ্ট!

একমাসের মধ্যে সে বিধবা হইয়া, হাতের শাঁখা খুলিয়া মাথার সিঁদুর মুছিয়া আবার সেই বাল্যসাথী মাণিকের কাছেই কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল।

বংশলোচনবাবু চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু তাহার চেয়েও বড় চিন্তার কারণ তাঁহার ঘটিল।

শ্যামসুন্দর হঠাৎ পড়িল অসুখে।

এবং মলিনার এত সেবা এত শুশ্রূষা, এত ডাক্তার এত কবি-

রাজ স্বত্তেও তেরো দিন অবিশ্রান্ত জ্বর ভোগের পর সে মলিনাকে কাছে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমি চললাম মলিনা, তুমি এসো।'

আর কিছু সে বলিতে পারিল না।

ক্রন্দন রত মণি ও মাণিকের মুখের পানে সজল চক্ষে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়াই সে চোখ বুজিল।

মলিনা বুক চাপ্‌ড়াইয়া হায় হায় করিতে লাগিল।

বুড়া বংশলোচন স্বচক্ষে পুত্রের মৃত্যু দেখিলেন।

এবং দেখিয়া অবধি সেই যে তাঁহার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল সেই মূর্চ্ছাই হইল তাঁহার কাল।

দিন কুড়ি পরে একদিন বৈকালে তাঁহার মূর্চ্ছা আর কিছুতেই ভাঙ্গিল না। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, মৃত্যু হইয়াছে।

কিন্তু এমনি মজা, যে-বংশলোচনবাবুর অসামান্য প্রতাপে একদিন সমস্ত রতনপুর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিত, আজ তাঁহারই মৃতদেহ শ্মশানে বহন করিয়া লইয়া যাইবার লোক আর সহজে জুটিল না।

নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল।

কেহ বলিল, 'বুড়ো অনেক পাপ করেছে জীবনে বাবা, ওকে ওইখানেই পচে' মরতে দাও।'

আবার কেহ বলিল, 'প্রায়শ্চিত্ত না করলে ওর মড়া ছোঁবে কে?'

কিন্তু পৃথিবীর মানুষ—সকলেই আর সমান নয়!

মাণিকের ছল-ছল দুটি চোখের পানে তাকাইয়া কাহারও কাহারও দয়া হইল। অতি শৈশবে মাতৃহারা, এই সেদিন—নিতান্ত অসময়ে তাহার বাবা মরিয়াছে, তাহার উপর এই বিপদ! বেচারা কি যে করিবে, কেমন করিয়া যে সবদিক সাম্‌লাইবে কে জানে।

মাণিক হাত-জোড় করিয়া সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাত্রি প্রায় ন'টার সময় দশজন মাত্র লোক জড়ো করিল এবং তাহাদেরই সঙ্গে লইয়া কোনোরকমে বৃদ্ধ পিতামহের মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেল।

কিন্তু বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না।

এই সেদিন সে এত টাকা খরচ করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছে, আবার বৃদ্ধ পিতামহের শ্রাদ্ধ। এবার আর কম খরচে চলিবে না।

গ্রামের লোক ধরিয়া বসিল, 'দানসাগর না করলে ত' আর উপায় নেই বাবাজি! অত বড় একটা লোক! এ ত' উল্কা পাত হয়ে গেল বাবা! তোমার বাবা বেঁচে থাকলে—। যাক্ সেকথা।'

কতক সম্পত্তি বেচিয়া কতক-বা বন্ধক রাখিয়া মাণিককে তাহার পিতামহের শ্রাদ্ধের এক বিরাট আয়োজন করিতে হইল।

এবং এই শ্রাদ্ধের পরেই মলিনা গেল মারা।

জ্বর জ্বালা বিশেষ কিছুই তাহার হয় নাই। দিব্যি সুস্থ সবল শরীর—হঠাৎ সেদিন রাত্রে সে মণিকে কাছে ডাকিয়া বলিল, 'বুকে একটু হাত বুলিয়ে দে ত' মা, বড় বেদনা করছে।'

মণির মুখখানি শুকাইয়া গেল।

আহা, শুকাইয়া উঠিবার কথাই।

উঠাউঠি দুজনের মৃত্যু তাহারা দেখিয়াছে। অসুখকে আর বিশ্বাস হয় না।

সেদিন হইতে মণি আর তাহার কাছছাড়া হইল না। মাণিকের ও তাহার নিজের জন্য চারটিখানি রান্না করিয়া লইয়াই আবার তাহার মা'র কাছে গিয়া বসিল।

মাণিক নিজে গিয়া শহর হইতে ভাল ডাক্তার আনিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পরদিন গভীর রাত্রে ওই দুটি ছেলে-মানুষ মণি ও মাণিককে পাশাপাশি তাহার চোখের সুমুখে বসাইয়া রাখিয়া মলিনা মরিয়া গেল।

মলিনার মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য লোক আর আসে না। বর্ষাকাল। সবে তখন বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। ঝম্ ঝম্ করিয়া আসে, আবার ঝম্ ঝম্ করিয়া চলিয়া যায়।

মাণিক আবার বিপদে পড়িল।

এবার তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,

'কেন? কেন তোমরা ওঁকে পোড়াতে যাবে না কেন শুনি?'

দু'একজন বলিল, 'কে বললে বল ত'? কেন যাব না? আমরা ত' প্রস্তুত।'

দু'একজন বলিল, 'আসল কথা আর লোকজনের সামনে কেন বাবা? চুপ কর।'

মাণিক চুপ করিল, কিন্তু তাহারা চুপ করিল না। মাণিকের কাণে-কাণে বলিল, 'জন-পিছু একটা করে' টাকা দিও, বাস্, আমি রাজি করে' দিচ্ছি।'

বিপদের সময় কি আর করে।

মাণিক তাহাতেই রাজি হইল।

এবার তাহারা একা।

মণি ও মাণিক।

মাণিক বড় হইয়াছে। বয়স প্রায় পঁচিশ পার হইতে চলিল। লেখাপড়া শেখে নাই। বিষয়-সম্পত্তি সে-রকম কিছু নাই। যাহা আছে—যৎসামান্যই। থাকিবার মধ্যে আছে শুধু ওই প্রকাণ্ড বাড়ীখানা। তাও আবার চারি চতুর্দ্দিক ভাঙা। সংস্কার অভাবে জরাজীর্ণ। সামনের দিকটা ভাল আছে। সেই দিকটাই কোনোরকমে বাসের উপযোগী করিয়া লইয়া দু'জনে তাহারা এক রকম সুখে স্বচ্ছন্দেই দিন কাটায়।

মণি মাত্র মাণিকের চেয়ে এক বছরের ছোট। যেমন রূপ, তেমনি গড়ন। এ আবার তাহার মাকেও যেন টেক্কা দিয়াছে। একপিঠ চুল—আল্‌গা করিয়া মাথায় বাঁধা, বিধবা বলিয়া শাড়ী পরে না, মাথায় সিঁদুর নেয় না,—পরণে চুল-পাড় ধুতি, পানের রঙে ঠোঁট দুটি রাঙা,—মাণিকের জন্য রান্না করে, তাহাকে খাওয়ায়, নিজেও খায়, আর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়।—যেমন চেহারা তেমনি চতুর!

হঠাৎ সেদিন মণির মনে হইল, মাণিকের বিবাহ দিতে হইবে। এমন করিয়া আর ভাল লাগে না। দশজনে দশকথা বলে, শুনিতে ঘৃণাবোধ হয়।

কিন্তু বিবাহ যে দিবে—মেয়ে কোথায়?

তবে আগ্রহ থাকিলে সবই হয়।

মেয়ের সন্ধান মিলিল।

ওপাড়ায় সেদিন বেড়াইতে গিয়া একটি মেয়েকে সে দেখিয়া আসিয়াছে।

মুখখানি বেশ ঢলঢলে’—

পটল-চেরা চোখ,

বাঁশীর মতন নাক,

মেঘের বরণ চুল

আর দেবীর মতন গড়ন।

নাম—যমুনা। বয়েস—এগারো কি বারো।

দোষের মধ্যে দোষ—গায়ের রং একটুখানি ময়লা।

তা হোক্। মেয়েটার কপাল ভাল।

অভিভাবকের মধ্যে গোটা চার-পাঁচ ছেলেমেয়ে লইয়া বিধবা এক ভা'জ, পয়সা-কড়ি খরচ করিয়া ননদের বিবাহ দেয়—না আছে এমন সঙ্গতি, না আছে লোকজন।

মণি সেদিন তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় বিবাহের কথাটা তাহার ভা'জের কাছে পাড়িয়া বসিল।

ভা'জের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

যমুনা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতেই তাহার বৌদিদি বলিল, 'পোড়ারমুখো অম্‌নি যায়নি মণি, আইবুড়ো বোন্‌টাকে চড়িয়ে গেছে আমার ঘাড়ে। গরীবের ঘরের মেয়ে—বেঁটে-খাটো হবে কোথা, ফন্ ফন্ করে' বেড়েই চলেছে দিন-দিন। বারো বছরের মেয়ে, মনে হয় যেন পনর বছরের ধিঙ্গি।—আয় লো আয়, মণির কাছে চুল বাঁধবি আয়।'

সেই চুল বাঁধিতে আসাই হইল তাহার কাল।

বয়সের অনুপাতে অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া চলার অপরাধে যমুনার মুখখানি তখন এতটুকু হইয়া গেছে। তেল চিরুণী লইয়া মণির কাছে আসিয়া বসিতেই মণি তাহার চুলগুলা খুলিয়া দিয়া আঁচ্‌ড়াইতে বসিল। হঠাৎ কি একটা কথা মনে হইতেই বাঁহাত দিয়া মুখখানি তাহার নিজের দিকে ফিরাইয়া বলিল,—

'কই দেখি মুখখানি!'

চোখ তুলিয়া মণির মুখের পানে তাকাইয়া যমুনা মাথা হেঁট করিল।

মণি জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার দাদাবাবুকে চিনিস্? মাণিককে?'

যমুনা ডানদিক পানে মাথাটা একটুখানি কাৎ করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, 'হুঁ।'

'কেমন? পছন্দ হয়?' বলিয়া মণি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'বিয়ে করবি ওকে?'

লজ্জায় যমুনা মাথা হেঁট করিয়া মুখখানা ফিরাইয়া লইল এবং সেই যে সে হেঁটমুখে পিছন ফিরিয়া বসিয়া রহিল, মণির কথায় সে আর মুখও তুলিল না, কথাও বলিল না।

চুল বাঁধা শেষ হইবামাত্র হাঁটু গাড়িয়া নতমুখে মণিকে একটি প্রণাম করিয়া হাত বাড়াইয়া পায়ের ধূলা লইয়া যমুনা সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

বৌ-দিদি সবই শুনিয়াছিল, কাছে আসিয়া বলিল,

'অত ভাগ্যি কি আর হবে ওর?'

মণি বলিল, 'হবে না কেন? লক্ষ্মী মেয়ে!'

বৌদিদি বলিল, 'শ্বাশুড়ী রেখে গেলেন ওকে এই এতটুক্‌খানি, নিজের হাতে মানুষ করেছি ভাই, ননদ বলে, মনে হয় না, মনে হয়—পেটের মেয়ে। আমার খোনা মোনা যেমন—ও-ও তেম্‌নি!'

এই বলিয়া সে একটুখানি থামিল, বলিল,

'জল খাও মণি। একটুখানি সন্দেশ-জল...গরীবের ঘরে...'

মণি হাসিতে লাগিল।

বলিল, 'জল খেতে ত' কই আর কোনো দিন বল না রাগিণী-বৌ! গরজ বড় বালাই—না?'

রাগিণী-বৌ লজ্জিত হইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কথাটা হঠাৎ পাল্‌টাইয়া লইয়া বলিল,

'না না তা বলিনি, সে জন্যে বলিনি, কিন্তু পয়সাকড়ি খরচ ত কিছু কর্‌তে পারব না দিদি, কি করে' কি হবে?'

মণি বলিল, 'দেখি—।'

এবং সেই যে 'দেখি' বলিয়া সে উঠিয়া গেল, তিনটি দিন সে আর এ রাস্তা মাড়াইল না। চারদিনের দিন পান খাইয়া হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,

'বৌ—ও বৌ, কোথা? রাগিণী-বৌ কোথা?'

যমুনা উঠানে দাঁড়াইয়াছিল। বলিল,

'নাইতে গেছে।'

বলিয়াই সে চলিতে যাইতেছিল, মণি খপ্‌ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং ধরিয়া ফেলিয়া কাছে টানিয়া আদর করিয়া গাল টিপিয়া চুমা খাইয়া বলিল,

'বেশ হবে, হাসবি, খেলবি, আমার কাছে থাকবি, ভালবাসব, চুল বেঁধে দেব, সাজিয়ে-গুছিয়ে কেমন দেখবি লক্ষ্মীটির মত করে' রাখব দিনরাত! কেমন?'

বলিয়া দুই হাত দিয়া আবার তাহার আনত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া মণি কেমন যেন অস্বাভাবিক একাগ্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

যমুনা তখন লজ্জায় আনন্দে এক-গা ঘামিয়া একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার পরেই বিবাহ।

মাণিকের উৎসাহ সেদিন দেখে কে!

গাঁয়ের লোকে বলে, 'থাম্ থাম্ অত কেন রে—অত কেন? আশী বছরের বুড়ো ধাড়ী,—পুঁচ্‌কে একটা মেয়ের জন্যে অত কেন বাপু?'

কিন্তু মাণিকের সে কথা কানে যায় না; দু'দিন পরে গায়ে এক-গা গয়না পরাইয়া, দামী-দামী দশ-বারো হাত শাড়ী দিয়া মুড়িয়া-শুড়িয়া যমুনাকে সে নিজের বাড়ী লইয়া যায়।

ওই অতটুকু মেয়ে যমুনা যেন তাহার কতকালের বৌ!

মাণিক এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখে, কেহ কোথাও নাই, মণি হয়ত রান্না করিতেছে, সুড়ি-সুড়ি বৌএর কাছে গিয়া আঁচলে তাহার টান মারিয়া বলে, 'শুনছো! লজ্জা-টজ্জা ভালবাসিনে আমি। আজকালকার ফ্যাসান্ অন্য রকম! ঘরে আমার আছেই বা কে যে লজ্জা করবে!'

ছায়াছবি

অতটুকু মেয়ে—লজ্জায় যেন এতটুকু হইয়া যায়। মুখের উপর অনেকখানি ঘোমটা টানিয়া দিয়া জড়সড় হইয়া বসে। গায়ের ঘামে বেনারসী শাড়ী ভিজিয়া একেবারে ড্যাবডেবে হইয়া ওঠে।

এদিক দিয়া ক্রমাগত প্রেম-নিবেদন চলিতে থাকে।

শাড়ীর অন্তরালে যমুনার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে।

মণি আসিয়া ঘরে ঢুকিবামাত্র মাণিক তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফ্যা ফ্যা করিয়া হাসিতে থাকে।

গম্ভীর মুখে ঘরের কাজ সারিয়া মণি আবার বাহির হইয়া যায়। ঘোমটার ফাঁকে সকরুণ ছুটি অসহায় দৃষ্টি মেলিয়া যমুনা একদৃষ্টে সেইদিক পানে একটিবার তাকাইয়াই আবার মুখ নামায়।

কিন্তু কি ভাবিয়া সিঁড়ি হইতে মণি আবার ফিরিয়া আসে।

বলে, 'আয় লো আয়, তুই আমার কাছে বসবি আয়!'

যমুনা যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচে।

বলিতে না বলিতে সে একেবারে উঠি-পড়ি করিয়া চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাহিরে মণির কাছে আসিয়া দাঁড়ায়।

মাণিক ভিতরে ভিতরে গুম্‌রিয়া গুম্‌রিয়া রাগিয়া রাগিয়া খুন হয়।

কিন্তু মুখে কিছুই বলিতে পারে না।

ছায়াছবি

ফুল-শয্যার রাত্রি!

ফুল চাই

মণি বলিল, 'ফুল কই গো, তোমার ফুল কই?'

মাণিক বলিল, 'ফুল? হ্যাঁ ফুল ত' চাই, কিন্তু এই সন্ধ্যেবেলা —এই অসময়ে ফুল আমি পাই কোথায়?'

সারাটা দিন বৌ-ভাতের লোকজন খাওয়ানো লইয়া মণি ব্যস্ত ছিল, বলিল, 'ও মা! সে কি! সকাল থেকে কতবার যে বললাম...আর তুমি...বলিয়া মাণিকের দিকে মুখ ফিরাইয়া গলাটা একটুখানি খাটো করিয়া চোখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'কচি খোকা!'

আহারাদির পর মণি আপনমনেই বলিতে লাগিল,

'যাক! কি আর হবে! এম্‌নিই হোক্। বাড়ীর ব্যাটা-ছেলে কিছু যদি না করে ত' আমি মেয়ে মানুষ—সারাদিন রইলাম খাওয়া-দাওয়ার হ্যাঙ্গামা নিয়ে—নইলে আমিই নিয়ে আসতাম। ফুলের জন্যে কিছু হচ্ছে না, তবে ফুল-শয্যা নাম—ফুল চারটি হ'লে ভাল হতো।'

এই-সব বলিতে বলিতে যমুনাকে লইয়া পাশের ঘরে—যেখানে তাহাদের বিছানা পাতা হইয়াছিল—সেইখানে গিয়া দেখে, নানা-রকমের ফুলে ফুলে বিছানা একেবারে বোঝাই! হাসিয়া বলিল,

'সবেতেই দুষ্টুমি! দেখচিস্ যমুনা, এম্‌নি আমার সঙ্গে দিবারাত্তির করে।—বড় হ',—বড় হ'লে তুইও হয়ত এমনি করবি। করবি ?'

বলিয়া মণি তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিল।

চোখোচোখি হইবামাত্র যমুনা একবার ফিক্ করিয়া হাসিয়াই মুখ নামাইল।

মণি বলিল, 'যা শোগে যা। একধারে চুপটি করে' শুয়ে থাক্। দেখি আবার উনি কোথায় গেলেন, দেখি।'

যান নাই কোথাও। উনি কাছেই ছিলেন। মণি বাহিরে আসিতেই অন্ধকার সিঁড়ির উপর মাণিকের সঙ্গে দেখা। অন্ধকারে বোধকরি কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগিতেই মণি সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল,

'সিঁড়িতে একটা আলো না দিলে আর চলবে না দেখছি।'

বলিয়াই চুপ্।

আর কাহারও কোনও সাড়াশব্দ নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে শোনা গেল—মণি বলিতেছে,

'যাও, ছেলেমানুষ একলা আছে—যাও 'শীগ্‌গির।'

পরদিন সকালে বড় আশা করিয়া মণি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গো রাণী, যমুনা-রাণী!'

যমুনা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, মুখও তুলিল না, কথাও বলিল না।

মণি তাহার সুমুখে বসিয়া মাথার ঘোমটাটা একটুখানি তুলিয়া দিয়া বলিল,

'কেন গো মুখ যে দেখি ভারি-ভারি?'

সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যমুনা হঠাৎ তাহার মাথাটা মণির কোলের উপর রাখিয়া বলিয়া উঠিল,

'আমি বাড়ী যাব।'

বলিয়াই কান্না!

'ও মা! ও কি!' বলিয়া মণি একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া সেইখানেই ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল। হেঁট হইয়া আঁচলের খুঁটে তাহার চোখ দুইটি মুছাইয়া দিয়া বলিল,

'কাঁদতে আছে,—ছি, কি হলো কি বল্?'

কিন্তু কি হইয়াছে কিছুই সে না বলিয়া শুধু কাঁদিতে থাকে আর বলে, 'আমি যাব,—না, আমি যাব, আমায় পাঠিয়ে দাও।'

মণি তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া কত বুঝায়, বলে, কিছু বলেছে দাদাবাবু?—ছি, কেলেঙ্কারী করতে নেই, চুপ কর্—লক্ষ্মী বোনটি আমার—চুপ করো।'

চুপ করাইতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগে।

এদিকে সকাল হইতে মাণিকের দেখা নাই। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া সে যে কোথায় গিয়াছে কে জানে। অন্যদিন

চা না খাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হয় না, আজ সে তাহাও খায় নাই।

ন্যাওটা ছেলের মত যমুনা সারাদিন মণির পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়।

দিনের শেষে রাত্রি হয়।

রাত্রের খাওয়া দাওয়া সারিয়া যমুনাকে আবার সে ভাল করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া বলে, 'ঘুম পেয়েছে তোর, চল্ শুবি চল্, দিয়ে আসি ওপরে।'

যমুনা তাহার আঁচল ধরিয়া টানাটানি করে। কিছুতেই যাইতে চায় না। ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'না—।'

মণি রাগিয়া বলে, 'ছি! কেলেঙ্কারী করিস নে—চল্।'

যমুনা ঘাড় নাড়িয়া 'না' বলিয়া আঁচল ধরিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়ে। মণি তাহাকে আর সেখান হইতে নড়াইতে পারে না।

কিছুতেই না পারিয়া শেষে মণি বলে, 'চল্ তবে আমিও যাই।'

দু'জনেই যায়।

মধ্যরাত্রে আচম্‌কা যমুনার ঘুম ভাঙিতেই দেখে,—চারিদিক অন্ধকার। আলোটা কোন্ সময় নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উন্মুক্ত জানালার বাহিরে প্রকাণ্ড কয়েকটা গাছের অস্পষ্ট ছায়া,—সন্ সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে, আকাশে একটি নক্ষত্র পর্য্যন্ত নাই।

ভয়ে ভাবনায় বিছানার উপর হাতড়াইয়া দেখে মণি কোন্ সময় উঠিয়া গেছে। ভাবে, সে এখান হইতে ছুটিয়া পালায়।

পালাইবার জন্য উঠিয়া বসে।

কিন্তু মাণিকের দৃঢ় মুষ্টির আকর্ষণে সহসা আবার তাহাকে বসিয়া পড়িতে হয়।

...গাছের আব্‌ছা ছায়াগুলাও ধীরে ধীরে তাহার চোখের সুমুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়।...

বাহিরে মসীকৃষ্ণ গাঢ় অন্ধকার—

যমুনার বুকের ভিতরটা কেমন যেন দুরু দুরু করিতে থাকে।

তাহার পর—

তাহার পর বিছানার একপাশে জড় সড় হইয়া সেই যে তাহার কান্না সুরু হয়, সে কান্না কেহ আর থামাইতে পারে না।

মাণিক তাহার হাতে ধরিয়া খানিকটা অনুনয় বিনয় করে, চুপি চুপি বলে, 'চুপ—চুপ্! সর্ব্বনাশ! চুপ করো, চুপ করো। —ছি!'

অবশেষে না পারিয়া এক লাথি মারিয়া বলে, 'বেরো তবে দূর হ' এখান থেকে!'

মণি বোধ করি সেইখানেই কোথাও শুইয়াছিল, গোলমাল শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিল, যমুনা খাটের নীচে পড়িয়া উপুড় হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে! কাছে গিয়া মাথাটা তাহার কোলের উপর তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা দিয়া চোখ মুছাইয়া বলিল, 'কি হলো কি রে যমুনা? কি হলো বল্ ত?'

মণির কোলে মাথা রাখিয়া যমুনা আরও জোরে জোরে কাঁদিতে লাগিল।

খাটের উপর হইতে মাণিক বলিয়া উঠিল,

'ঘুঁটে কুড়ুনীর মেয়ে—এত দেমাগ্ কিসের? বললে কথা শোনে না, মুখের ওপর বচসা—ভাল লাগবে কেন? ভাল লাগে কখনও?'

রাত্রিটা কোনোরকমে কাটিল। সকাল হইতে যমুনা একটি-বারের জন্যও মণির কাছছাড়া হয় নাই।

মণি রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল, যমুনা হঠাৎ এক সময় রান্নাঘর হইতে উঠিয়া বলিল, 'আসি।'

মাণিক কিছুক্ষণ আগে উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, মণি ভাবিল হয়ত যমুনাও তাহারই কাছে যাইতেছে, খুশী হইয়া বলিল, 'যা।'

পাছে সে লজ্জা পায় ভাবিয়া আর কিছু সে বলিল না, নীরবে ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মাণিকের খাওয়া শেষ হইল।

মণি ডাকিল, 'আয়—যমুনা, আয় খাবি আয়।'

ভাবিল, কাল হয়ত রাত্রি জাগিয়া পাশের ঘরে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু পাশের ঘরে গিয়া দেখে, যমুনা নাই।

উপর নীচে সবগুলা ঘরই মণি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু যমুনাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

মণি বলিল, 'একি! কোথায় গেল সে?'

মাণিক বলিল, 'তাইত'।'

কিছুক্ষণ ভাবিয়া মণি বলিল, 'বাড়ী পালালো না ত? যাব যাব করছিল,—আচ্ছা, তুমি বসো ততক্ষণ, দেখে আসি আমি একবার ঝপ্ করে'।'

বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

ও-পাড়ায় তাহাদের বাড়ী।

বাড়ী গিয়া দেখে, সত্যই তাই; যমুনা কোন্ সময় পালাইয়া আসিয়া বৌদিদির কাছে কান্নাকাটি সুরু করিয়াছে।

মণিকে দেখিবামাত্র রাগিণী-বৌ নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।—

'এসো এসো, এসো ভাই এসো।'

গম্ভীর মুখে মণি বলিল, 'না, বস্‌ব না। দেখতে এলাম—বিয়ের কনে' না বলে' কয়ে পালিয়ে এলো, তাই বলতে এলাম—যদি তোমার কাছেই এসে' থাকে ত' আর যেন সে না যায়।'

কথাটা পরিহাসের কথা ভাবিয়া রাগিণী-বৌ ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'ছোট মেয়ে—বুদ্ধিশুদ্ধি এখনও...যাও ভাই যাও তোমাদের বৌ নিয়ে যাও!—যা লো যা, ঠাকুরঝির সঙ্গে; এসেছিস্ বেশ করেছিস, ঢং করে' আর কাঁদতে হয় না,—যা!'

এই বলিয়া যমুনার হাত ধরিয়া সে উঠাইতে গেল, কিন্তু যমুনাকে কোনো প্রকারেই সেখান হইতে উঠানো গেল না, জানালার একটা কাঠের গরাদে ধরিয়া এম্‌নিভাবে সে বসিয়া রহিল যে, এত টানাটানি সত্ত্বেও রাগিণী-বৌ তাহাকে না পারিল উঠাইতে না পারিল এদিক পানে মুখ ফিরাইতে।

ব্যাপারটা দেখিয়াই মণি সরিয়া পড়িয়াছিল।

পিছন ফিরিয়া মণিকে দেখিতে না পাইয়া রাগিণী-বৌ ডাকিল,

'মণি! ঠাকুরঝি, ও ঠাকুরঝি! চলে গেলে নাকি?'

বলিয়া তাহার পিছু পিছু ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া দেখিল, রাস্তার উপর মণি তখন অনেক দূরে চলিয়া গেছে। রাগিণীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, তবু সে একবার চাপা-গলায় অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকিল,—'ঠাকুরঝি!'

পথে লোকজন ছিল না, মণি পিছন ফিরিয়া জোরে জোরে তাহাকে শুনাইয়া দিল,—'পাঠিয়ো না বৌ, ওকে আর

পাঠিয়ো না। তোমাদের কেলেঙ্কারীর ভয় না থাকতে পারে, কিন্তু দাদাবাবুর আছে। লোক দিয়ে পাঠাও ত' তোমায় অতি-বড় দিব্যি রইল বৌ।'

কথাটা শুনিবামাত্র রাগিণী-বৌএর মুখখানি শুকাইয়া মলিন হইয়া গেল, বাঁ-চোখের কোণে মুক্তার মত এক ফোঁটা চোখের জল টল্ মল্ করিতে লাগিল এবং সেই যে সে কাঠের মূর্ত্তির মত চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল মণি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেখান হইতে সে নড়িল না।

মণিকে দেখিবামাত্র মাণিক চেঁচাইয়া উঠিল,

'আছে? আছে সে, ওখানে আছে?'

মণি তাহার কাছে আসিয়া বলিল,

'হ্যাঁ গেছে।—কিন্তু বেশ আক্কেল যা-হোক! ছি! ছি।'

মাণিক বলিল, 'ছোটলোকের মেয়ে—ওর আর কত আক্কেল হবে।'

মণি তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল,

'না গো না, ওর' আক্কেলের কথা বলিনি। বলছি—তোমার।'

'আমার?' বলিয়া মাণিক একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'বিয়ে তুই দিলি কেন তবে? আমি ত' চাইনি।'

'কেন দিলাম ?' বলিয়া প্রত্যুত্তরে মণিও একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'ভগবান জানেন!'

মাণিক তাহার চোখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে মণির গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িয়া দুই হাত দিয়া তাহাকে একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল,

'ধেৎ তেরি ভগবানের নিকুচি করেছে!—কেন, বেশ ত' ছিলাম, বেশ ত' ছিলাম।'

বলিয়া মণিকে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া মাণিক মুখখানা তাহার মুখের কাছে আগাইয়া লইয়া গেল।

দুই হাত তুলিয়া মণি তৎক্ষণাৎ তাহার মুখখানা ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া মাণিকের বাহুপাশ হইতে সজোরে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

মনে হইল, সহসা কে যেন তাহার সারামুখে খানিকটা সিঁদুর মাখাইয়া দিয়াছে।

মাণিক তখনও হাসিতেছিল।

মণি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, লজ্জা নেই তোমার।'

মাণিক বলিল, 'লজ্জা? তুই আবার লজ্জার মানুষ হলি কবে থেকে?'

ছায়াছবি

বিবাহের পর অষ্ট-মঙ্গলার দিন জামাইএর শ্বশুরবাড়ী যাইবার কথা।

মাণিক কিন্তু গেল না।

রাগিণী-বৌ মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসিল।

পাড়ার একটি মেয়েকে সে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া মাণিকের কাছে পাঠাইয়াছিল; মাণিক জবাব দিয়াছে, সে যাইবে না।

মণির আর দেখা পাওয়া যায় না। পাইলেও বা রাগিণী-বৌ তাহার হাতে-পায়ে ধরিয়া যেমন করিয়া হোক্ তাহার কাছে ক্ষমা চাহিত।

শেষে তাহার যত রাগ গিয়া পড়িল যমুনার উপর।

যমুনা যতক্ষণ বাহিরে থাকে নিশ্চিন্তমনে হাসিয়া খেলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘরে ঢুকিলেই মুখখানি তাহার মলিন হইয়া উঠে, বৌদিদি তিরস্কার করেন, কাছে ডাকিয়া বলেন,

'করলি কি হতভাগী, করলি কি! তুই নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করলি।'

বলিতে বলিতে চোখ দুইটা তাহার ছল ছল করিতে থাকে।

যমুনা ছুটিয়া পালায়।

পালাইয়াও নিষ্কৃতি পায় না।

পাড়ার মেয়েরা দেখিতে পাইলেই কাছে ডাকে।

'শোন্ শোন্—ওলো ও যমুনা, শোন্!'

কাছে আসিলে আদর করিয়া ভালবাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'পালিয়ে এসেছিলি কেন লা? কি হয়েছিল কী?'

জবাব না দিয়া সেখান হইতেও যমুনা চলিয়া যাইতে চায়, কিন্তু দুষ্টু মেয়েরা যাইতে দেয় না, জোর করিয়া ধরিয়া রাখে, হাসিতে হাসিতে বলে, 'বল্ না!'

যমুনা মুখ ভারি করিয়া হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া থাকে।

এমনি করিয়াই দিন চলে।

প্রসঙ্গটা ক্রমেই লোকে ভুলিয়া যায়।

ভুলে না মাত্র একজন।

নাম—কাত্যায়নী।

ঘরে তাহার তিন-তিনটে আইবুড়ো নাৎনী। যখন-তখন রাগিণী-বৌএর বাড়ী বেড়াইতে আসে। নিতান্ত হিতৈষীর মত দু'দণ্ড বসিয়া দু'টা সুখ-দুখের কথা কয়।

'তা মা আইবুড়ো নাম ত' ঘুচেছে। আর—আমার দেখ না কপাল!'

রোজ সেই একই কথা।

ঘরের কাজ করিতে করিতে রাগিণী-বৌ আপন মনেই জবাব দেয়, 'লোকের চোখ টাটাবার কথাই বটে। হয়েছিল ভালই, কিন্তু কপালগুণে আমার হওয়া না-হওয়া সমান হয়ে গেল।'

চোখ টাটাইবার ইঙ্গিতটা কাত্যায়নী যে বুঝিতে পারে না এমন নয়; কিন্তু সময়-বিশেষে সব কিছু হজম করিবার অভ্যাস তাহার আছে বলিয়াই চট্ করিয়া কথাটা সে পাল্টাইয়া লয়। বলে,

'পরের কি চোখ টাটাবে মা, এতে যার আট্‌কাবে, চোখ টাটাবে তারই। তবে শোনো মা, বলি, যদি বললে, তবে বলি শোনো।'

বলিয়া গলাটা তাহার একটুখানি খাটো করিয়া সে আবার বলিতে থাকে, 'ওই যে মণিটিকে দেখছ, ওই মণিটি তোমার কম নয় মা!—'পরের ঘরের পর-গিন্নি, দেখে লাগে শাকচিন্নি!' তা সে—যে যা-ই করুক্, 'তেল-সরষে একই হবে কলু-মাগীই পর।' ননদটিকে তোমার বড় হতে দাও, যুগ্যিমন্ত হোক্, তারপর দেখে নিও—ঢের দেখেছি মা, ওই তোমার যমুনাই হবে মাথার মণি,—মণি কোথায় ফট্ ফটাবে।'

রাগিণী-বৌ সে কথার কোনও জবাব দেয় না।

কাত্যায়ণীকে সে চেনে।

কথাটা মিথ্যা নয়।

যমুনা ধীরে-ধীরে বড় হইয়া ওঠে। দু'বছর পরে তাহাকে আর সে যমুনা বলিয়া চেনাই যায় না।

নিভৃত-নিরালায়—লোকজন যখন কাছে কেহ না থাকে, নিজেই সে তখন নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে বারে-বারে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকায়। কপালে কাচ-পোকার টিপ্, সিঁথিতে সিঁদুর, আঁচলে চাবির রিং, হাতে শাঁখা,—কলসী-কাঁখে পুকুরে সে জল আনিতে যায়, নিতান্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গী-সাথী যাহারা থাকে, কথায় কথায় তাহাদের সঙ্গে হয়ত শ্বশুর বাড়ীর কথা ওঠে, সবাই আপন আপন স্বামীর কথা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতে থাকে।

যমুনা বলে, 'আমায় ত' কেউ তাড়িয়ে দেয় নি ভাই, আমি নিজেই চলে' এসেছি।—আবার নিতে আসবে, তখন যাব।'

বড় আশা করিয়া কথাগুলা বলে বটে,

নিতে কিন্তু আসে না।

যমুনা দিনের পর দিন গোণে।

সমবয়সী বন্ধু চাঁপা বলে, 'কই লো, এলো না ত ?'

যমুনা হাসিতে হাসিতে বলে, 'চল্ ভাই আমরা ওই পাড়া দিয়ে বেড়াতে যাই।—যাবি ?'

চাঁপাও হাসিয়া বলে,—'হ্যাঁ, চল্।'

বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়ায়।

'চল্ না, কম্লিদের বাড়ী যাই।'

যমুনাই শেষে উঠিতে চায় না। ঘাড় নাড়িয়া বলে,

'না লো না, মিছে করে' বললাম। তাই যায় নাকি ? ছি !'

বাড়ীর কাছেই গোল্‌দারী দোকান।
যমুনা পান না কি আনিতে গিয়াছিল
হাতে পান লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে—

সুমুখে মাণিকের সঙ্গে দেখা।

মাথার কাপড় টানিতে গিয়া হাতের পান পড়িয়া গেল। মাটিতে।

হেঁট হইয়া পান কুড়াইতে গিয়া গায়ের কাপড় লইয়া অস্থির !

এদিক টানে ত' ওদিকটা আল্‌গা হয়, ওদিক সাম্‌লাইতে গিয়া এদিক লইয়া শশব্যস্ত !

অবশেষে বেচারা একেবারে নাস্তানাবুদ হইয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া বুকের কাপড়টা তুলিয়া দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া কি কষ্টে যে রাস্তাটা পার হইয়া বাড়ীর দরজায় গিয়া পৌঁছিল তাহা একমাত্র সে-ই জানে

খবরটা ঢাক পিটাইয়া সকলকে বলিবার নয়।

অথচ এমন মজার সংবাদ কাহাকেও না বলিতে পাইয়া যমুনার বুকের ভিতরটা কেমন যেন আই-ঢাই করিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেকথা কাহাকেও বলা আর তাহার হইয়া উঠিল না।

সেই দিনই বৈকালে মাণিকের বাড়ী হইতে পাল্‌কি আসিল, পাল্‌কি-বেহারা আসিল,—সঙ্গে আসিল একজন ঝি।

রাগিণী-বৌএর নামে মাণিক একখানি চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল,—'পত্র পাঠ উহাকে পাঠাইয়া দিবেন। পাল্‌কি পাঠাইলাম। কোনও অন্যথা না হয়। না পাঠাইলে ইহাই শেষ জানিবেন।'

রাগিণী-বৌ প্রস্তুত হইয়াই ছিল।

যমুনাকে তৎক্ষণাৎ সাজাইয়া-গুছাইয়া আল্‌তা পরাইয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া আনন্দে একটুখানি অশ্রুবর্ষণ করিয়া পাল্‌কিতে চড়াইবার জন্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

যমুনাও হেঁট হইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বৌদিদি তখন জোর করিয়া নিজের কান্না থামাইল, আদর করিয়া যমুনার চোখ মুছাইয়া চুমা খাইয়া বলিল,

'কেঁদো না লক্ষ্মীটি, ছি, কাঁদতে নেই। স্বামীর ঘর করতে যাবে,—কান্না কিসের? ঠাকুর-জমাই যখন যা বলবে তখ্‌খুনি তাই ক'রো, মণির কথা শুনো। আশীর্ব্বাদ করি, জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকো।'

তাহার পর হাতে ধরিয়া পাল্‌কিতে তুলিয়া দিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল,

'আসব আসব কোরো না লক্ষ্মীটি, পালিয়ে যেন কখ্‌খনো এসো না। ও-ই তোমার নিজের বাড়ী, ওইখানেই জন্ম জন্ম রাজত্ব কোরো।'

বেহারারা তাড়াতাড়ি করিতেছিল।

'বৌ-ঠাকরুণ, সরো।' বলিয়া নিজেরাই পাল্‌কির দরজা দুইটা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া পাল্‌কি কাঁধে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইবার জন্য ভিতর হইতে যমুনা বোধ করি পাল্‌কির দরজাটা ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, খড়্‌ খড়্‌ করিয়া শব্দ হইতেই রাগিণী-বৌ ছুটিয়া একটুখানি আগাইয়া গেল, কিন্তু বেহারারা তখন সশব্দে মার্‌ মার্‌ করিয়া পাল্‌কি লইয়া আগাইয়া চলিয়াছে, কোনোপ্রকারেই সেখান পর্য্যন্ত সে আর পৌঁছিতে পারিল না। ফিরিয়া আসিল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মেয়ের শ্বশুরবাড়ী যাওয়া দেখিবার জন্য পাড়ার অনেক হিতৈষী মেয়ে তখন দরজার কাছে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাগিণী-বৌএর চোখ দুটা ছল্‌ ছল্‌ করিতেছিল, তাহাদের দিকে সে আর ফিরিয়াও তাকাইল না, নিজের ছেলেমেয়ে গুলাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া কোনোরকমে চৌকাঠ পার করিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া, সমবেত মেয়েগুলার মুখের উপরেই দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

যমুনা দেখে—

মণির কেমন-যেন রাগ-রাগ ভাব।

আগের মত তেমন আর আদরও নাই, আপ্যায়েতও নাই।

অবাক হইয়া সে শুধু এদিক-ওদিক তাকায়—

মনে হয় যেন—সব দোষ তাহারই।

রাত্রে মাণিক বাড়ী ফেরে।

ফিরিয়াই জিজ্ঞাসা করে, 'কি গো মণি, কেমন দেখছ?'

বলিয়াই পায়ের জুতা খুলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায়।

বলে, 'আমার সঙ্গে ত' আর কথাবার্ত্তা কইবে না; জিজ্ঞেস্ কর দেখি—জব্দ হয়েছে কি না!'

মণি সে কথার কোনও জবাব দেয় না, গম্ভীর মুখে ধীরে-ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

কিন্তু জব্দ সে হয় নাই......

রাত্রে আহারাদির পর শুইতে গিয়া মাণিক হঠাৎ কেমন করিয়া না-জানি টের পাইল—জব্দ হওয়া দূরে থাক্, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যমুনার লজ্জা যেন আরও একটুখানি বাড়িয়াছে।

আগে যদি-বা গায়ে জোর ছিল না, আজকাল আবার গায়ের জোরে খানিক্‌টা জেদ বজায় রাখে।

সেই যে মুখ ফিরাইয়া ঘট্‌কা মারিয়া পড়িয়া থাকে, তাহার আর নড়ন্‌-চড়ন্‌ নাই।

দশটা ডাকে একটা সাড়া দেয়, চোখ বুজিয়াই বলে, 'উঁ।'

গরীব লোকের মেয়ে, গয়না পাইয়াছে, কাপড় পাইয়াছে, তাহার মত স্বামী, পরম সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করা দূরে থাক্, এত দেমাগ্ যে তাহার কোথা হইতে আসে কে জানে!

মাণিক তবু চেষ্টার ক্রটি করে না।

অবশেষে হার মানিয়া মাণিক রাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়। বলে,—

'সকাল হোক্ কাল। তারপর তোর জেদ কেমন তাই দেখি। আবার যদি না বিদেয় করি ত'—'

বলিয়া সে একটা কঠিন শপথ করিয়া বসে।

বিদায় করিবার কথায় যমুনা ভয় পায়।

ভয় পাইবার কথাই।

—সত্যই যদি সে আবার তাহাকে জোর করিয়া পাঠাইয়া দেয় !...

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া ভয়ে-ভাবনায় যমুনা শেষে লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া মাণিকের দিকে নিঃশব্দে একটুখানি আগাইয়া আসে।

মাণিক তখন পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে।

টের পায় কিনা কে জানে।

টের বোধকরি সে পায় না।

যমুনার চোখে কিন্তু ঘুম নাই। জাগিয়া জাগিয়া শুধু এপাশ-ওপাশ করে, আর বিদায় করিয়া দিবার কথাটাই ভাবে।

মরীয়া হইয়া শেষে ঘুমের ভাণ করিয়া একখানা হাত তাহার মাণিকের গায়ের উপর রাখিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে।

মাণিক তবু জাগে না।

শেষে এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়ে।

জাগিয়া উঠিয়া দেখে, সকাল হইয়া গেছে।

কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে মাণিক যে শপথ করিয়াছে দিনের আলোয় তাহা সে ভুলিয়া যায়।

যমুনা যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচে।

সেদিন আর সে উপর হইতে নীচে নামে না।

হাব-ভাব-ইঙ্গিতে মাণিকের মনে হয় যেন সে এইবার একটুখানি জব্দ হইয়াছে।

মুখে কিছু বলে না মনে-মনে ভাবে, তবে সে থাক্।

মাণিক আবোল্-তাবোল্ কত-কি বলিতে থাকে।

বলিতে বলিতে হাসে।

হাসিয়া বলে, 'কেন, এই ত' বেশ রয়েছ।'

যমুনাও হাসে।

হাসিয়া কি যেন বলিতে যায়, কিন্তু পদশব্দে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়াই দেখে, মণি!

বোধ করি কোনও কাজের জন্য সে ঘরে ঢুকিতেছিল, সহসা ইহাদের মুখোমুখি বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে আর চৌকাঠ ডিঙাইল না, তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরিয়া যেমন আসিয়াছিল আবার তেমনি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

মাণিক জোরে জোরে বলিল, 'চলে' গেলি যে মণি?'

সিঁড়ি হইতে মণির কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—

'থাক্, তোমরা বেশ আছ।'

দিনের বেলাটা কোনোরকমে কাটে তাহাদের মন্দ নয়।

রাত্রে আর যমুনাকে ঠেলিয়া জোর করিয়া পাঠাইতে হয় না। নিজেই যায়।

কিন্তু ভাব তাহাদের বেশিক্ষণ থাকে না।

হঠাৎ কেমন করিয়া যে তাহাদের হাসি-গল্পের স্রোতটা বন্ধ হইয়া গিয়া ঝগড়া সুরু হয়, যমুনা নিজেই তাহা ভাল বুঝিতে পারে না।

যমুনার ভাল লাগে না।

কিন্তু মাণিকের উৎসাহ যেন সব দিকেই সমান।

ভালবাসিতেও যেমন, আবার ঝগড়া করিতেও তেমনি।

কিছুতেই যেন দমে না।

এম্‌নি করিয়াই রাত্রি কাটে।

এম্‌নি করিয়াই চারিটি রাত, চারিটি দিন।

এবং এই দুই নব-দম্পতীর প্রেম-লীলার মাঝখানে মণি যেন আর 'থই' পায় না।

পাঁচদিনের দিন সকালে ভগবান যেন একটুখানি মুখ তুলিয়া চান। অকূলে যেন কূল মিলে।

স্নান করিয়া একপিঠ চুল এলাইয়া দিয়া পাশের ঘরে মণি কাপড় ছাড়িতেছিল, 'মাণিক ঘরে ঢুকিতেই তাড়াতাড়ি কাপড়টা সে কোনোরকমে তাহার গায়ে জড়াইয়া লইয়া বলিল,

'কি!'

মাণিক বলিল, 'পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে।'

ভিজা কাপড়টা নিঙ্‌ড়াইবার জন্য চৌকাঠের বাহিরে গিয়া নিতান্ত বোকার মত মণি হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল,—

'কা'কে ?'

মাণিক হাসিল। বলিল, 'তোকে।'

কাপড়টা তারে মেলিয়া দিয়া মণি পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'বাঁচি তাহলে।'

মাণিক বলিল, 'মিছে নয়। মাইরি বলছি।'

এমন সময় নীচে হইতে কে যেন ডাকিল,—'বাবু!'

মাণিক বলিল, 'ওই শোন্।'

'কে ?'—বলিয়া মণি জানালার কাছে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, পাল্‌কি প্রস্তুত।

বলিল, 'কেন, এ আবার কি ? এত ভাব তোমাদের চট্‌লো কখন্ ?'

মাণিক বলিল, 'না, না, ভারি বজ্জাৎ।'

'তাই নাকি ?' বলিয়া নিতান্ত উদাসীনের মত মণি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, 'যাস্ যে ?'

মণি দাঁড়াইল না।

—'বেলা হয়ে গেছে।' উনোনে আগুন দিই।

'বেশ, বাঃ !'—বলিয়া মাণিক যেন একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়াই চট্‌পট করিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং খুব খানিকটা সাড়াশব্দ করিয়া একজন বেহারা ডাকিয়া যমুনার বাক্সটা নীচে পাঠাইয়া দিয়া হাঁকিল,—'কই ? কোথা গেল সে ?—বেরো বেরো শীগ্‌গির বাড়ী থেকে, বেরো বল্‌ছি,—দূর্ হ' !'

ব্যাপারটা যে গুরুতর হইয়াছে মণি তাহা বুঝিয়াছিল, আরও ভাল করিয়া বুঝিল, ক্রন্দনরতা যমুনাকে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া।

মণি যেন দেখিয়াও দেখিল না।

আপন মনেই উনানে কয়লা দিতে লাগিল।

যমুনা ডাকিল,—'দিদি!'

মণি তেমনি পিছন ফিরাইয়া বলিল, 'কি!'

কিন্তু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগে যমুনার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

একটি একটি করিয়া কয়লা সাজানো শেষ করিয়া মণি উঠিয়া দাঁড়াইল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া যমুনার মুখের পানে একবার তাকাইল। তাহার পর ধীরে ধীরে একটুখানি আগাইয়া আসিয়া নিতান্ত উদাসীনের মত কহিল, 'কি জানি ভাই, তোমাদের লীলা-খেলা কিছু বুঝতে পারি না আমি।'

যমুনা বলিল, 'যেতে আমি চাইনি।'

বলিয়া সে আর নিজেকে যেন সাম্‌লাইতে পারিল না। রান্না-ঘরের কালি-মাখা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

'কাঁদুক্।'

মণি তাহাকে চুপ করাইবার কোনও চেষ্টাই করিল না। বলিল, 'আচ্ছা যাও, এম্‌নি করেই আবার একদিন আনতে পাঠাবে, তখন এসো।'

কথাটা শুনিবামাত্র যমুনার কি যে হইল কে জানে। একটি কথাও সে আর মুখ দিয়া বাহির করিল না। হঠাৎ মাথা নোয়াইয়া মণির পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিতে মুছিতে নিজেই সে পাল্‌কিতে গিয়া চড়িয়া বসিল।

যমুনাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া রাগিণী-বৌ ত' অবাক্!

—'একি! চলে' এলি যে?'

একজন বেহারা বাক্সটা ধীরে ধীরে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

যমুনা কাঁদিতেছিল, কথাটার কোনও জবাব দিল না।

'মর্ হারামজাদী! দোর-গোড়ায় কেন,—ঘরে গিয়ে কাঁদ্!'

বলিয়া রাগিণী-বৌ তাহার হাতে ধরিয়া ঠেলিয়া ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া রাগে অভিমানে একেবারে কাঁদ-কাঁদ হইয়া অন্যত্রে চলিয়া গেল।

চলিয়া গেল বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকিতে পারিল না, আবার কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,

'নিজে চলে' এলি?'

ছেলেমেয়েগুলা যমুনাকে ঘিরিয়া বসিয়া গোলমাল করিতেছিল, কথাটা সে ভাল শুনিতে পাইল না, চোখ মুছিয়া বৌদির মুখের পানে মুখ তুলিয়া চাহিল।

বৌদিদি আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'নিজে থেকে চলে' এলি ?'

মুখে কিছু না বলিয়া যমুনা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—'না।'

'তবে ? জোর করে' পাঠিয়ে দিলে ?'

যমুনা বলিল, 'হুঁ।'

বলিয়াই ঘাড় হেঁট করিল।

চোখে তখন তাহার জল আসিয়াছে।

রাগিণী-বৌ বলিল,

'ঘটা করে' নিয়েই বা যাওয়া কেন, আবার জোর করে' পাঠিয়েই-বা দেওয়া কেন বাপু ? কি করেছিলি কী ?'

এবার আর যমুনা মুখ তুলিয়া চাহিলও না, জবাবও দিল না,—চোখ দিয়া শুধু তাহার দর দর করিয়া জল গড়াইয়া গাল বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া কাপড়ের উপর পড়িতে লাগিল।

রাগিণী-বৌ কিছু বুঝিতে পারিল না।

এ কি তামাসা, না কি !...

মণির আজকাল কি যে হইয়াছে কে জানে।

মাণিককে আর একদণ্ডের জন্য ছাড়িতে চায় না।

দিবারাত্রি চোখে-চোখে রাখে।

ঘরের বাহির হইয়া গেলে রাঁধা বাড়া করিয়া দোরের কাছটিতে উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকে।

ফিরিয়া আসিলে বলে,

'গিয়েছিলে নাকি ?'

কোথায় ?'

ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া মণি ঈষৎ হাসিয়া বলে,

'কোথায় আবার !'

ইঙ্গিতটা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া বলে,

'না।'

মণি বলিল, 'না কেন, আহা কতদিন গেছে, কতদিন গ্যাখনি মুখখানি !'

মাণিক হাসিয়া বলিল,

যাঃ !'

মণি বলিল, 'যা কেন ? কারও সঙ্গে কথা বলবার অবসর ছিল না...মুখে মুখ দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা...কিছু দেখিনি বুঝি ?'

মাণিক হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসা করিল,—'আচ্ছা মণি, কদিন থেকেই একটা কথা মনে হচ্ছে আমার। সত্যি বলবি ?'

মণি খাটের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মাণিকের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল,

'মিথ্যে কোনোদিন বলেছি তোমার কাছে ?'

মাণিক বলিল, 'তোর ভাল লাগে না। না ?'

বালিসে মুখ গুঁজিয়া ঘাড় নাড়িয়া মণি বলিল,

'না।'

'বিয়ে তবে তুই দিলি কেন?'

বলিয়া প্রশ্নটার জবাব লইবার জন্য মাণিক তাহার দিকে একটুখানি আগাইয়া আসিল।

কিন্তু মণির কাছ হইতে তাহার কোনও জবাব পাওয়া গেল না। সেই যে সে বালিসে মুখ গুঁজিয়া পিছন ফিরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সেখান হইতে আর নড়িল না।

বিবাহ যে সে তাহার কেন দিয়াছে সেকথা জানেন অন্তর্য্যামী!

নারীর সেই চিরন্তন কামনা......

গৃহ চাই, সন্তান চাই, স্বামী চাই, সংসার চাই!

কিন্তু কোনোটিই তাহার চাহিবার নয়। চাওয়া আজ তাহার কাছে পাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বিধবা।

এবং ইহারই সূত্র ধরিয়া বিশ্রী একটা জন-প্রবাদ কানাঘুষা হইতে হইতে একদিন তাহারও কানে আসিয়া পৌঁছিল।

—পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা এত বোকা নয়! মাণিক বিবাহ করিয়া সংসারী যে কেন হয় না সে কথা, বুঝিতে তাহাদের বাকি নাই। মণি যতদিন আছে বিবাহ ততদিন যে স্থগিত থাকিবে তাহা নাকি সকলেই জানে।......

কাত্যায়ণী তাহার নাৎনী তিনটির জন্য একবার চেষ্টা করিয়া-

ছিল। কিন্তু দেখিতে তাহাদের একটিও ভাল নয় বলিয়া সর্ব্বপ্রথম তাহাতে বাধা দিয়াছিল—মণি।

তাই কাত্যায়নীর বিষ-জিহ্বা মণি সম্বন্ধে অনেক কথাই প্রচার করিয়াছে।

'বিয়ে কি মণি ওকে করতে দেবে নাকি? তাই দেয় কখনও?'

এবং শুধু কাত্যায়নী নয়—আরও কত লোক কত কথাই না বলিতে সুরু করিল।

লোকের মুখে হাত চাপা দেওয়া যায় না।

মণির মনের কথা মনেই থাকে।

কথাগুলা তাহার কানে আসিবার পর হইতে মণির শুধু ওই একটিমাত্র চিন্তা—কেমন করিয়া এ কলঙ্কের অপবাদ হইতে মাণিককে সে মুক্ত করিবে।—সুন্দর একটি মনের মত বৌ, বোনের মত তাহাকে ভালবাসিবে, আদর করিবে, যত্ন করিবে, বৌএর ছেলে হইবে, মেয়ে হইবে,—নিজের হাতে সে তাহাদের কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিবে।

নিজের না হোক্,—ইহজন্মের আশা তাহার আর নাই,—কিন্তু গৃহের কর্ত্রী হইয়া পরের ছেলে মানুষ করিয়াও ত' জন্মের সাধ অনেকে মিটায়!...

এমনি-সব অনেক কথা ভাবিয়া, অনেক দিনের এই চিন্তাটিকে সযত্নে মনের মধ্যে লালন করিয়া, যমুনাকে সে ঘরে আনিয়াছে।

এ-কথা মাণিকের কাছে কেমন করিয়াই বা সে মুখ ফুটিয়া বলে!

কিন্তু ব্যাপারটা আজকাল আবার অন্যরকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যমুনা ছিল নিতান্ত ছোট,—দিব্যি শান্ত শিষ্ট মেয়ে। মণি ভাবিয়াছিল, চিরকাল হয়ত তাহাকে ঠিক অম্‌নিটিই দেখিবে।

মাণিকের অত্যাচারে নিজে হইতে চলিয়া গিয়াছিল, মণি তাহাকে আনিবার জন্য কোনোপ্রকার উচ্চবাচ্য করে নাই। কিন্তু কাহাকেও না জানাইয়া মাণিক যেদিন হঠাৎ তাহাকে আবার লইয়া আসিল, দেখিল, সেই যমুনা অনেক বড়টি হইয়াছে, স্বভাবের সে মৃদু কমনীয়তা আর নাই, অগ্নিশিখার মত কেমন যেন একটি উগ্র তেজস্বিণী ভাব! বিকশিত পুষ্পের মত সৌন্দর্য্যে-সুষমায় যৌবনের ঐশ্বর্য্যে গরবিণী হইয়া সে যে আবার একদিন এমন অকস্মাৎ তাহার চোখের সুমুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহা সে কোনোদিন ভাবিতে পারে নাই।

মাণিককে সে চেনে এবং বোধকরি বেশ ভাল করিয়াই চেনে। কেমন যেন সে ধীরে-ধীরে তাহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

যাওয়াই স্বাভাবিক।

যাইবে সে জানে। তবু যেন তাহার বুকের ভিতরটা টন্ টন্ করিয়া ওঠে, বিজয়িণীর পদপ্রান্তে পরাজয়ের স্বীকারোক্তিটুকু লিপিবদ্ধ করিতে কষ্ট বোধ হয়।

কিন্তু বেশিদিন মণিকে আর তেমন করিয়া কাটাইতে হয় না।

গর্ব্বোদ্ধত শির নত করিয়া যমুনাকে আবার যেদিন সেখান হইতে চলিয়া যাইতে হয়, মণি তাহার মনের আনন্দ মনেই চাপিয়া রাখে।

কোমর বাঁধিয়া আর একবার সে উঠিয়া পড়িয়া লাগে। সেবায় যত্নে আদরে আব্দারে মাণিককে কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা চলিতে থাকে।

সংসারের যাবতীয় কাজ মণি তাহার নিজের হাতেই করে, এক দণ্ডের জন্য ঘরের বাহির হয় না, ঘর-দোর সব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, মাণিকের যখন যেটির প্রয়োজন তৎক্ষণাৎ সে তাহাই তাহার হাতের কাছে আগাইয়া দেয়।

খাবার ঠাঁই করিয়া মাণিককে দুবেলা খাইতে বসাইয়া পাখা হাতে লইয়া নিজেও সে তাহার কাছে গিয়া বসে,—এটা খাও ওটা

খাও বলিয়া মাথার দিব্যি দিয়া প্রত্যহ তাহাকে প্রচুর পরিমাণে না খাওয়াইয়া ছাড়ে না।

মাণিক তাহার মুখের পানে তাকায় আর হাসে।

মণি জিজ্ঞাসা করে, 'হাসছো যে?'

মাণিক বলে, 'এম্‌নি।'

মণি কিন্তু কিছুতেই ছাড়ে না। বলে,

'না তোমায় বলতে হবে।'

মাণিক বলে, 'আমার আদর-যত্ন একটুখানি বেড়েছে আজকাল,—না?'

মণি বলে, 'বাড়াবাড়ি কি দেখ্‌লে? আর কি কখনও করিনি নাকি?'

'করেছ, কিন্তু এত নয়।'

মণি বলে, 'বেশ ত', তাতে তোমার কিছু অসুবিধে আছে কি?'

মাণিক নীরবে শুধু একবার ঘাড় নাড়িয়া আপনমনেই খাইতে থাকে।

মণি বলে, 'অসুবিধে হয় ত বোলো, আর না হয় করব না। যার কাজ সে-ই এসে করবে।'

মাণিক বলিল, 'তাকে আর আনব না। থাক্‌ ও বাপের বাড়ীতে, কতদিন থাকতে পারে দেখি।'

মণি এবার আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল,

'একবার শুধু পথে-ঘাটে দেখা হওয়ার অপেক্ষা!—না, লুকিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছ তাই-বা কে জানে।'

মাণিক ঘন ঘন ঘাড় নাড়িয়া বলিল,

'মাইরি, না।'

বলিয়াই সে একটুখানি থামিয়া মণির মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা ওর মতলবটা কি বলতে পারিস?'

'তা আমি কেমন করে' জানব বল!'—মাছের অম্বল আর-একটুখানি এনে' দি,—তুমি উঠো না।'

বলিয়া হাতের পাখাটা নামাইয়া মণি উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠোঁটের ফাঁকে সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া বলিল,

'তুমি কিন্তু একটি আস্ত জানোয়ার।'

মাণিক হাসিয়া বলিল, 'যাঃ!'

মণির সাজ-পোষাকের চটক্ যেন একটুখানি বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। রান্না করে ত' কাপড়ে একটুখানি দাগ লাগে না। বৈকালে সাবান দিয়া গা ধোয়, খোঁপা বাঁধে, ভাল ভাল ধুতি পরে, জামা গায়ে দেয়।

মাণিক হাসে। বলে, 'বলিহারি! এত ঢংও জান!'

মণি তাহার গায়ের জামাটির পানে হেঁটমুখে একবার তাকায়। হাসিয়া বলে, 'নাঃ, কাল থেকে আর পারব না।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে ঘরের মধ্যে বিনা কাজেই এদিক-ওদিক পায়চারি করিতে করিতে বলে,

'তাই ত' বলি,—এই যে সব সাজ-পোষাক, এ-সব দিলে কে? তখন একদিন না পরলে হতো রাগ, আর আজ হয়েছে ঠিক তার উল্টো! এমনি সংসারের নিয়ম।'

মাণিক এবার নিজেই সে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার চেষ্টা করে। বলে, 'তোকে যে আজকাল কিছু বলবার জো নেই দেখছি।— কিন্তু বাপু ছাখ্, তোর ও ফিরিঙ্গি-খোঁপা না কি বলে ওকে— ও আমার ভাল লাগে না। ভিজে একপিঠ চুল এলিয়ে—'

ভিজা একপিঠ এলানো চুলের উপর লোভ তাহার অনেক-দিনের। তাই সে কথাটার মাঝখানে মণি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, 'মাইরি আর-কি! রোজ-রোজ চান করি, ভিজে মাথায় ঘুরে' বেড়াই, তারপর অসুখ-বিসুখ হোক্, মরে' যাই,—টেনে ফেলে দাও, জ্বালা জঞ্জাল চুকে যাক্। কেমন?'

মুখে সে একথা বলে বটে, কিন্তু তাহার পরদিন হইতে দেখা যায়, খোঁপা সে আর বাঁধে না, প্রত্যহ স্নান করে, স্নান করিয়া একপিঠ ভিজা চুল তাহার পিঠের উপর এলাইয়া দেয়।

মাণিক ঠিকই বলিয়াছে—

মণিকে মানায় ভাল। ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া রাখে, সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া দু'একটি চূর্ণ

কুন্তল কখনও-বা মুখে, কখনও-বা বুকের উপর আসিয়া পড়ে, কপালের ঠিক মাঝখানে সিঁথি, কালো দুটি ভুরুর তলায় স্বচ্ছ দুটি আঁখিতারা এখনও তেমনি চঞ্চল, সারা দেহে অম্লান যৌবন-শ্রী, —মণি বারে-বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া মাণিকের ঘরে গিয়া ঢোকে; মাণিক ঘরে না থাকিলে দেওয়ালে-টাঙ্গানো বড় আর্শীটির সুমুখে গিয়া দাঁড়ায়, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে কিনা দেখে, ছোট ওই মেয়েটার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইবার আশা তাহার কোনোদিন আছে কিনা তাহাই ভাবে।

কিন্তু প্রত্যহ একপিঠ চুল ভিজাইয়া স্নান করা তাহার সহিবে কেন?

প্রথম দিন নাক সুর-সুর করে,
দ্বিতীয় দিন হাঁচি হয়,
তৃতীয় দিন মাথা ধরে,
চারদিনের দিন—জ্বর।
এমন জ্বর যে—একেবারে শয্যাশায়ী।
না হয় রান্না, না হয় খাওয়া।
মাণিক ত' ভাবিয়াই অস্থির!

গায়ের উপর মোটা মোটা দু'তিনটা লেপ চাপাইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি মেলিয়া মণি জিজ্ঞাসা করিল, 'কই, তুমি গেলে?'

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায়?'

মণি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,

'আঃ! কতক্ষণ থেকে বলছি, তবু গেলে না?'

কিন্তু কিছুই সে বলে নাই।

জ্বরের ধমকে হয়ত ভুল বকিতেছে ভাবিয়া মাণিক তাহার কাছে আসিয়া কপালে হাত দিয়া বলিল, 'চুপটি করে' একবার ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি, জ্বরটা বেড়েছে বড্ডো।'

মণি গোঁ গোঁ করিয়া পাশ ফিরিয়া বলিল,

'অপরাজিতা-দিদির কাছে যাও তুমি একবারটি, বল—মণির জ্বর হয়েছে, বললেই আসবে এক্ষুণি।'

মাণিক বলিল, 'কে? অপরাজিতা? প্রকাশের বৌ? ·ধেৎ! তার চেয়ে নিজেই বরং রেঁধে খাব বাবা, পরের খোসামুদি—ধেৎ!'

বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া মাণিক উঠিয়া দাঁড়াইল।

মণির জ্বরটা তখন সত্যই বাড়িতেছিল। তন্দ্রার ঘোরে সে চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

বৈকালে দেখা গেল মাণিকের বাঁ-হাতে একটা ন্যাকড়া বাঁধা

সারাদিনের মধ্যে এক গ্লাস জল ছাড়া মণি আর কিছু খায় নাই; মাণিক এক গ্লাস জল আনিয়া দিতেই হাতে-বাঁধা ন্যাকড়াটা তাহার চোখে পড়িল; বলিল, "ও কি?"

মাণিক ইচ্ছা করিয়া তাহার কাপড়ের নীচে তাড়াতাড়ি ঢাকা দিয়া বলিল, "কিছু না।"

যা-হোক একটা কিছু বলিয়া দিলেও বা ছিল ভাল, কিন্তু তাহার এই গোপন করিবার সলজ্জ চেষ্টা টুকুই মণির মনে সন্দেহ জাগাইয়া তুলিল। ঘাড় নাড়াইয়া বলিল, "বল না কি হলো ?"

বলিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, এবার আর সে কোনো-রূপ দ্বিধা সঙ্কোচ না করিয়া কাপড়ের তলা হইতে হাতখানা বাহির করিয়া বলিল, "হবে আর কি ! হাতটা পোড়ালাম ভাত রাঁধতে গিয়ে।"

মণি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, ওমা, ভাত তুমি নিজে রাঁধলে ? কেন ? মানকের মা এলো না ?"

মাণিক কহিল, "আস্‌বে না কেন, ওসব যাকে-তাকে ডাক্‌তে যাওয়া বাপু আমার ভাল লাগে না।"

মণি সে কথার কোন জবাব দিল না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মাণিকের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

মাণিকের মুখ দেখিয়া মনে হইল কি যেন একটা জবাবের সে প্রত্যাশা করিতেছিল, কিন্তু জবাব না পাইয়া সজোরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি আর করি বল, যেমন আমার কপাল ! এ ক'টা দিন আমি নিজেই রাঁধি।"

মণির মুখ দিয়া এবারেও কিছু জবাব পাওয়া গেল না, সেও একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে কড়ি কাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

রোজ যেমন যায় বৈকালে সে দিন ও তেম্‌নি মাণিক বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া দেখে, জ্বর-গায়েই মণি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়াছে, ঘরে আলো জ্বালিয়া তোলা-উননে লুচি ভাজিতেছে।

"এ কি! এ আবার কি করছিস্?"

মাণিকের মুখের পানে তাকাইয়া মণি বলিল, "কিছু না। ভাবলাম ফিরতে তোমার দেরী হবে।"

"কই দেখি!" বলিয়া মাণিক চট্ করিয়া মণির গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিল, তখনও রীতিমত জ্বর, তাহার উপর আগুনের আঁচে থাকিয়া গায়ের উত্তাপ যেন আরও বাড়িয়াছে। মণির হাত হইতে লুচি-ভাজা ঝাঁঝ্‌রাটা কাড়িয়া লইয়া মাণিক তাহাকে খুব খানিকটা তিরস্কার করিয়া বলিল, "আমায় আর অত ভাল বাস্‌তে হবে না—যা শোগে যা!"

মণির মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না, ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া সে তাহার বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িল।

মাণিক নিজের হাতেই লুচি ভাজিল, তরকারি করিল, তাহার পর লণ্ঠনটা হাতে লইয়া এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া ফিরিয়া নীচে নামিয়া গেল। রান্না ঘরের শিকল খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া একবার এ-দিক ও-দিক তাকাইয়া আবার উপরে উঠিয়া আসিল; জিজ্ঞাসা করিল, "ছোঁড়াটা দুধ দুইয়ে আজ কোথায় রেখে গেছে? কই, কোথাও যে পাচ্ছি না।"

মণি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিল ধীরে ধীরে বলিল, "কড়াই সুদ্ধ দেখ তোমার পেছনে রেখেছিলাম।"

মাণিক দেখিল, কড়াই আছে কিন্তু দুধ নাই। বলিল কই, নেই ত'।"

"আছে"। বলিয়া মণি এই দিক পানে পাশ ফিরিয়া বলিল, "ওই যে!"

খালি কড়াইটা মাণিক হাত দিয়া নাড়িয়া বলিল কোথায়?

নিতান্ত উদাসীনের মত মণি বলিল, "বেড়ালে খেয়েছে তা' হ'লে।"

"বেড়ালে?" অতখানা দুধ বেড়ালে খেলে? ছি ছি ছি ছি—আমার কপালটাই এম্‌নি দেখ্‌চি!"

মণি চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু মাণিক চুপ করিল না, বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে কড়াই ঝাঁঝ্‌রা, চাকা, বেলুন সরাইয়া রাখিল, আগুন সমেত উনানটা সরাইতে গিয়া বলিল,—বাপ্‌রে বাপ্‌, এ কী ঝক্‌মারি কাজরে বাবা! হাত পুড়লো, এইবার অষ্টাঙ্গ পুড়বে।...বিয়ে যে করলাম, আর কিছু না-হোক্‌—অসময়ে যে চারটি রেঁধে দেবে—তা'ও না। বাপের বাড়ী গিয়ে দিব্যি হয়ত হেসে খেলে বেড়াচ্ছে এতক্ষণ।" আপন মনেই এই-সব বলিতে বলিতে উনানটা সে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া নীচে রাখিয়া আসিল।

নিজের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে মাণিক জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই কি খাবি মণি?"

"কিচ্ছু না।" বলিয়া মণি চোখ বুজিয়াই পাশ ফিরিয়া চাদরটা টানিয়া আপাদ মস্তক মুড়ি সুড়ি দিয়া শুইল।

মাণিক চলিয়া যাইতেছিল, মণি ডাকিল,—"শোনো!"

"কি"? বলিয়া মাণিক ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"যমুনাকে কাল আন্‌তে পাঠাও।"

মাণিক তাহার আরও খানিকটা কাছে আসিয়া মণির মুখের পানে একবার তাকাইল, দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল, মুখখানা ভাল দেখা গেল না, মনের ভাবটা ও আন্দাজি টের পাওয়া কঠিন,—মাণিক হাসিয়া বলিল—রাগ করে বলছিস্ না ত?"

'না',—বলিয়া মণি ঘাড় নাড়িল।

যথাসম্ভব গম্ভীর হইয়া মাণিক চিবাইয়া চিবাইয়া কহিল,—আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম।...নিজে পাঠিয়ে দিয়ে আবার যেচে...তা' হোক্, তা' ছাড়া আর উপায় কি বল্?"

বলিতে বলিতে মাণিক যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। মণির মুখের পানে তাকাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল কিচ্ছু খাবিনে?—জল রেখে যাব এক গ্লাস? রাত্রে যদি পিপাসা পায়?

মণি নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িল।

মাণিক তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল.—"জ্বর রয়েচে এখনো, কিছু না খাওয়াই ভাল।"

পরদিন সকালে উঠিয়াই মণি বলিল,—নিজে আন্‌তে যাও, নইলে সে আস্‌বে না হয়ত'।"

কূয়ার কাছে বসিয়া মাণিক সাবান মাখিয়া স্নান করিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল,—"নিজে ?—আচ্ছা।"

তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া ভাল কাপড় জামা পরিয়া মাণিক সেদিন নিজে গিয়াই যমুনাকে লইয়া আসিল।

যমুনা আসিল। মণির কাছে গিয়া হেঁট মুখে ডাকিল—"দিদি !"

মণি বোধ করি ঘুমাইতেছিল, সাড়া পাওয়া গেল না।

যমুনা আবার ডাকিল—"দিদি !"

মুখ না তুলিয়াই মণি বলিল,—উ !

যমুনা জিজ্ঞাসা করিল—জ্বর হয়েচে ?

এবারে সে ও ঠিক তেম্‌নি ভাবেই জবাব দিল—"হুঁ।"

যমুনা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস পাইল না, পাশের ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া উনানে আগুন দিতে বসিল।

কাজকর্ম্ম দেখিয়া মনে হইল এবার যেন কে তাহাকে প্রত্যেকটি বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া শিখাইয়া দিয়াছে। এতটুকু ত্রুটি কোথাও নাই।

মণি বলে,—"কিছু খাবনা।"

যমুনা বলে,—"তাই কি হয় ! কিছু না খেলে শেষে উঠ্‌তে পারবে কেন ?"

গাই গরুগুলি দেখা শুনা করিবার জন্য ঘরে যে চাকরটা ছিল

তাহাকে দিয়া দোকান হইতে সাগু আনাইয়া যমুনা তাহাই এক বাটি তৈরী করিয়া মণির কাছে দাঁড়ায়। বলে—"ওঠো দিদি।"

মণি কিছুতেই খাইতে চায় না।

যমুনা বলে, "না খাইয়ে আমি উঠ্‌ব না এখান থেকে।"

বাধ্য হইয়া তাহাকে শেষে খাইতে হয়।

এমনি করিয়াই দিনের পর দিন তাহার সেবা শুশ্রূষা চলিতে থাকে।

জ্বর কিছুতেই সারে না, ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে দশ দিনের দিন একেবারে যায় যায় !

দূরের শহর হইতে পাশ করা ডাক্তার আসিল। বিকারের ঘোরে মণি তখন ভুল বকিতেছে।—"কই,—এসো তুমি একবার আমার কাছে সরে এসো, দেখি তোমার মুখখানি।"

—আসবে না ? হ্যাঁগা, কই এলে না ত ?"—যাবে, তুমি ওরই কাছে যাবে ? আমি বুঝি তোমার কেউ নই ?

বলিয়াই সে তাহার চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া কট্‌মট্‌ করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বিকারের ঘোরেই উঠিয়া বসিতে চায়। বলে, —দাঁড়াও তবে তাই দেখি আমি ওকে !...কত বড় শয়তান।"

ধরাধরি করিয়া টানিয়া তাহাকে আবার জোর করিয়া শোয়াইয়া দিতে হয়।

ডাক্তারি ঔষধ চলিতে থাকে।

মাণিক জিজ্ঞাসা করে,—"বাঁচবে ত ?"

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া, আশ্বাস দেয়। বলে,—হ্যাঁ, ভয় তেমন কিছু নেই আপনার।"

তিন দিন পরে জ্বর কমিল।

ডাক্তার ঘুমের ঔষধ দিয়াছেন। মণি ঘুমাইতেছিল। যমুনাকে মাণিক পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "ঘুমোও একটু-খানি। রাত জেগে জেগে মুখখানি শুকিয়ে গেছে।"

এই বলিয়া বিছানার ওপর তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া মাণিক একদৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

যমুনা তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল—হ্যাঁগা, দিদির বরকে তুমি দেখেচ?"

কথাটা মাণিক প্রথমে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। বলিল,—"কে?"

"দিদির বর।"

মাণিক হাসিয়া বলিল—মণির? হাঃ, ওদের ওই বিয়েই হয়েছে শুধু, স্বামীর মুখ কোনোদিন দেখেনি হয়ত।'

যমুনা বলিল, "দেখেছে, দেখেছে, তুমি জানো না।"

"জানি না? তুমি জান্‌লে কেমন করে?"

যমুনাও হাসিল। বলিল,—জানি আমি। দিদিকে আমি জিজ্ঞেস করব, দেখো, সেরে উঠুক।

মাণিক নিষেধ করিল।—"না, জিজ্ঞেস্ কোরো না,—ছি! মনে হয়ত কষ্ট পাবে।"

কথাটা যমুনা ও বুঝিল। বুঝিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। গায়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করা হয়ত সত্যই অন্যায়।

মাণিক বলিল, "তুমি ওসব জান্‌লে কেমন করে?" কই, আমিত জানি নে।"

যমুনা সে কথার জবাব না দিয়া বলিল,—শুধু তাই নয়, ওদের খুব ভাব ছিল তু'জনের।"

"বাঃ, তুমি যে অনেক জানো দেখ্‌চি। মণি বলেছে নাকি?"

যমুনা বলিল,—তুমিও ত ছিলে তখন। বিকারের ঘোরে কত কথা বল্লে,—শুন্‌লে না?"

মাণিকও শুনিয়াছিল। চট্ করিয়া তাহার মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। তবু সে জোর করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিয়া যমুনার হাত ধরিয়া নাড়িয়া বলিল,—"দূর পাগ্‌লী! বিকারের ঘোরে মানুষ কত কথা বলে, ওসব কি আর সত্যি হয় কখনও?"

এই বলিয়া প্রসঙ্গটা সে তাড়াতাড়ি চাপা দিবার জন্য যমুনাকে আদর করিয়া সোহাগ করিয়া বলিয়া উঠিল,—বিয়ের পর কেন তুমি ওরকম করতে বলত? এই ত' বেশ রয়েছ লক্ষ্মীটি।

মাণিকের মুখের পানে আড়চোখে একবার তাকাইয়া যমুনা ফিক্ করিয়া একবার হাসিয়া লজ্জায় বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

ছায়াছবি

দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর মণি সারিয়া উঠিল। কিন্তু মেজাজ তাহার খিট্‌খিটে হইয়া গেছে। তাহার সে রূপ নাই, সে জৌলুশ নাই। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহখানি টানিয়া টানিয়া ঘরের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়, উপর-নীচে ওঠা-নামা করে, আর, সামান্য কথাতেই রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া ওঠে।

প্রথম দিন কতক অত্যন্ত ক্ষুধা পাইত। বেলা ন'টা না বাজিতেই দু' তিনবার দেখিয়া যাইত যমুনার রান্না হইয়াছে কি না! না হইলে সে চেঁচামেচি করিয়া অস্থির করিয়া তুলিত।—"সকাল সকাল পিণ্ডি চারটি গিল্‌ব ভাবলাম, তা কি আর হবে ছাই ;— না বাপু নিজেই চারটি রাঁধব আপনার।"

কথা শুনিয়া যমুনা হাসিতে থাকে। বলে, "তোমার আজকাল ক্ষিদে একটু বেড়েচে, না দিদি ?"

হ্যাঁ, ক্ষিদে বাড়াইত দেখ্‌চিস্ আমার! পরে আরও কত কি দেখ্‌বি।"

মণি মিথ্যা বলে নাই—

পরে সে আরও কত-কি দেখুক আর না-ই দেখুক, সেই দিনই

রাত্রে যমুনা যাহা শুনিল তাহার পর আর বিশেষ কিছু দেখিবার প্রয়োজন হয় না।

উপরের ঘরে আলোর সুমুখে বসিয়া মণি একটা কাঁথার গাঁয়ে পেন্সিল দিয়া ফুল আঁকিতেছিল। যমুনা রান্না করিতেছিল নীচে।

রান্না শেষ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেই যমুনা দেখে, মণির ঘরে আলো নাই, অন্ধকারে ফিস্ ফিস্ করিয়া কে যেন কথা কহিতেছে।

জানালার কাছে যমুনা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। হাতের চুড়িগুলি ঠেলিয়া ঠেলিয়া কনুইএর কাছ পর্য্যন্ত তুলিল—পাছে শব্দ হয়; তাহার পর বন্ধ কবাটের গায়ে কান পাতিয়া চুপ করিয়া চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ফিস্ ফিস্ করিয়া যে ব্যক্তি কথা কহিতেছিল সে যে মাণিক তাহা সে অতি সহজেই টের পাইল। বৈকালে সে বাহির হইয়া গিয়াছিল ইহার মধ্যে কোন সময়ে যে সে ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে দোতালার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়াছে—ইহাই আশ্চর্য্য।

যমুনা নানারকম করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, কখনো বা কপাটের জোরের মুখে, কখনো এদিকে কখনও বা ওদিকে,—একবার ডান কান একবার বাঁ কান পাতিয়া শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিল, কিন্তু মোটা গলার ফিস্ ফিস্ আওয়াজ সেখান হইতে কিছুই ভাল বুঝা গেল না।

কিয়ৎক্ষণ পর আর একজনের কণ্ঠস্বর!

এবার আর অস্পষ্ট নয়, স্পষ্ট নারী কণ্ঠ। এবং সে যে মণি তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই, ছড়া কাটিয়া বলিল—

"যখন তোমার কেউ ছিল না আমায় ছিলে রত
এখন তোমার সব হ'য়েছে আমি হ'য়েছি তেতো।"—

—যাঃ ও, আমার আর ভাল লাগবে কেন?

হঠাৎ ঘরের মধ্যে কাহার যেন উঠিবার শব্দ হইল।

যমুনার শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিবার ইচ্ছা হইলেও সে দাঁড়াইতে পারিল না। পা টিপিয়া টিপিয়া পাশের ঘরে আসিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সব যেন ওলট পালট হইয়া গেল। চোখের সুমুখে অন্ধকার পৃথিবীটা যেন ঘুরিতেছে, কান দুইটা তখন গরম হইয়া উঠিয়াছে। চোখ-মুখও জ্বালা করিতেছিল। যমুনা সেখানেও থাকিতে পারিল না, ছম্ ছম্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গিয়া রান্না ঘরের দরজার কাছে থমকিয়া দাঁড়াইল। উপরের পানে মুখ তুলিয়া চাইতেই দেখে মণির ঘরে আলো জ্বলিতেছে।

সেই কোন সকালেই মাণিক কিছু না খাইয়া বাহির হইয়া গেছে। যমুনা রান্না করিতেছিল। বেলা প্রায় দশটার সময় উপরের রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া মণি বলিল, 'রান্না তোর হয়ে

গেল নাকি যমুনা? উনোনে আগুন রাখিস্, মাগুর মাছ আন্তে গেছে।”

কথাটা শুনিবামাত্র যমুনার অষ্টাঙ্গ যেন পুড়িয়া গেল। রান্না তখন তাহার প্রায় শেষ হইয়াছে। জবাব ত' সে দিলই না, কথাটা যেন সে শুনিতেই পায় নাই এম্নি ভাবে উনানে চড়ানো তরকারীটা খুন্তি দিয়া খুব খানিকটা সাড়াশব্দ করিয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল।

মণিও ভাবিল, সে শুনিয়াছে ঠিক, তাই সে আর দ্বিতীয়বার বলিবার প্রয়োজন বোধ করিল না।

উনান হইতে কড়াই নামাইয়া যমুনা যেমন বসিয়াছিল সুমুখে তারের জাল দেওয়া জানালাটার বাহিরে উঠানের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া তেম্নি ভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

......গত রাত্রে মাণিক তাহাকে কত আদর করিয়া কত সোহাগের কথা শুনাইয়াছে।

যমুনা নির্জ্জীবের মত পড়িয়াছিল মাত্র, একটি কথাও বলে নাই।

সকালে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিবার সময় মাণিক তাহাকে কিছুতেই যেন আর ছাড়িতে চায় না।—“কত যে তোকে ভালবাসি পাগ্লী, বুক্‌চিরে' দেখাবার হ'ত যদি ত' দেখাতাম।”

এত দুঃখেও যমুনার হাসি পাইল। ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসিয়াই সে তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হইয়া গিয়া রাগে গিস্ গিস্ করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; হাতের কাছেই বাল্‌তিতে ছিল জল ঘটি

দিয়া তাহাই সে ডুবাইয়া লইয়া জ্বলন্ত উনানের উপর বার কতক ঢালিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। দরজায় শিকলটা তুলিয়া দিয়া উপরে উঠিয়া যাইবে, পশ্চাতের বারান্দা হইতে মণি ডাকিল, "যমুনা !"

"কি ?"

"নিবিয়ে দিলি উনোন ?"

সেদিক পানে না তাকাইয়াই ঘাড় নাড়িয়া যমুনা বলিল, "হ্যাঁ ?"

মণি তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করিল, "কেন, আমি না বারণ করলাম !"

কিন্তু সে কথার কোনও জবাব না দিয়াই যমুনা উপরে উঠিয়া আসিল, বলিল, খেয়ে নেবেত'

খাওগে, যাও। সে এখন আস্‌বে না।"

মণির সঙ্গে এমন করিয়া কথা সে কোনোদিন বলে নাই। মুখখানা ও কেমন যেন রাগ রাগ।

মণি কিয়ৎক্ষণ হতভম্বের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া যমুনাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল,—"মাগুর মাছ নিজেও ভালবাসেন কিনা, তাই নামটি করবামাত্র যেন লাফিয়ে উঠ্‌লো,—এক্ষুণি আনব,—আজই আনব। আমি বললাম হাজার বার,—যেয়ো না যেয়ো না, সে কি আর সহজে পাওয়া যায়, নাইতে খেতে আজ তাহ'লে দেরী হ'য়ে যাবে। কিন্তু আমার কথা কি আর আজকাল উনি শুন্‌চেন নাকি...

যমুনা তখন ঘরে ঢুকিয়া কি করিতেছিল কে জানে। মণি

আবার বলিল, "উনানটা নিবিয়ে দিলি, ধরাইগে যাই।"—বলিয়া একবার তাহার ঘরে ঢুকিয়া আবার বাহির হইয়া আসিল। বলিল, "দেশলাইটা কি হলো? সন্ধ্যা বেলা আলোটা কাল আমার নিবে গেল হঠাৎ, দাদাবাবু বললে, দাঁড়া জ্বেলে দিই, বলে' পকেট থেকে দেশলাই বের করে' আলোটা জ্বেলে দিয়ে গেল। গেল কোথা দেশলাইটা? তুই জানিস যমুনা?"

ঘরের ভিতর হইতে অনুচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল,— "না।"

"বলি, তোর হ'ল কি?—হ্যাঁলা!" বলিয়া মণি ঘরে ঢুকিয়া দেখে, যমুনা তখন মেঝের উপর হাত পা' ছড়াইয়া শুইয়াছে।

মণি আবার ডাকিল, "যমুনা!"

"কি?"

"কি, হ'য়েছে কি তোর?"

বিরক্ত হইয়া যমুনা জবাব দিল,—হবে আবার কি?

মণি কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, —বটে, কই এত তেজ এত অভিমানত তোর ছিল না!"

যমুনা চুপ করিয়া রহিল।

মণি বলিল,—"এবার গিয়ে ওই সব শিখে এলি নাকি?"

যমুনা এবার মুখ না তুলিয়াই রাগিয়া উত্তর দিল, শিখে এসেছিত' না হয় আবার তাড়িয়ে দিও।"

কথা শুনিয়া মণি অবাক হইয়া গেল। রাগ তাহার অনেকক্ষণ হইতেই হইয়াছিল, সেও আর সহ্য করিতে পারিল না। ঘর হইতে

বাহির হইবার সময় বলিয়া গেল,—"এবার গিন্নি হ'য়েচ, এবার না-হয় তুমিই আমাকে তাড়িয়ে দিও।"

মাছ লইয়া মাণিক যখন বাড়ী ফিরিল বেলা তখন দুপুর।

ফিরিয়া দেখে, রান্না অনেকক্ষণ হইয়া গেছে, বাড়ী নিস্তব্ধ; যমুনা এক ঘরে মণি আর এক ঘরে। দু'জন দু'ঘরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে।

যমুনাকে মাণিক প্রথমে উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু জাগিয়া যে ঘুমায় তাহাকে উঠানো কঠিন। যমুনা উঠিল না।

মণির গায়ে হাত দিতেই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিল, "আন্‌লে মাছ?"

"মাছ ত' আন্‌লাম, কিন্তু ওর কি হ'ল বল দেখি?"

মণি বলিল, "হবে না? মাথায় তুলেছ।"

যমুনার রাগের কারণ মাণিক আন্দাজি কতকটা বুঝিতে পারিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খেয়েছ?"

"আমি?"—মণি তাহার ওষ্ঠ প্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি খাই নি। আমি খাব কেন? যতদিন গতর ছিল ততদিন খেয়েছি, খাইয়েছি।—গতরের নাম যাদুমণি, সবাই বলে এসগো ধনী।' এখন সে গতরও নেই, সে রূপও নেই—

সেই আদরও নেই।...বেলা হয়েচে, চল, নাইবে চল, বেঁচে যতদিন আছি ততদিনত' দিই।"

এই বলিয়া মণি তাহার শীর্ণ দুর্ব্বল দেহখানি কোন রকমে টানিয়া টানিয়া নীচে নামিয়া গিয়া দেখে, ইহারই মধ্যে যমুনা কোন্ সময় উঠিয়া আসিয়া রান্নাঘরে বসিয়া ভাত বাড়িতেছে।

সেদিনের মত সেখানেই ঠাণ্ডা।

এ লইয়া কেহ আর উচ্চবাচ্য করে না।

মণি তাহার দেহের কঙ্কালটিকে আবার একবার নূতন করিয়া সাজাইবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া ওঠে।

বেশী বেশী করিয়া খায়; ভাবে তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিবে। লুকাইয়া লুকাইয়া মুখে হাতে সাবান মাখে, চুল আঁচড়ায়, শাড়ী পরে, আল্‌তা নেয়।

যমুনা সেদিন উপরের ঘরে মাণিককে খাইতে দিয়া নীচের রান্নাঘর হইতে মাছ না কি আনিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখে, সাজ গোজ করিয়া তালপাতার একটা পাখা হাতে লইয়া থালার একপাশে বসিয়া আছে—মণি! মাণিক একটুখানি থতমত খাইয়া গেল কিন্তু মণি বেপরোয়া, পিছনের দিকে পা দুইটি ছড়াইয়া দিয়া এক হাত মাটিতে রাখিয়া আর এক হাত সে এক অপরূপ ভঙ্গিতে, মাণিককে বাতাস করিতে লাগিল ত' লাগিলই।

মাছের বাটিটা ঠক্ করিয়া থালার এক পাশে নামাইয়া দিয়া যমুনা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

দু' এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া মাণিক বলিল, "নতুন আমের আচার তোমার কেমন হ'য়েচে দেখি ?"

মণি চুপি চুপি বলিল, "তাড়াচ্ছ নাকি ?"

বলিয়া পাখাটা তাহার হাত হইতে সেইখানেই নামাইয়া রাখিয়া আচার আনিতে গেল।

আচার লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে, যাহা ভাবিয়াছিল সত্যই তাই। যমুনা তাহার শূন্য স্থান দখল করিয়া বসিয়া আছে।

মণি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। না পারিল চলিয়া যাইতে, না পারিল বসিয়া থাকিতে।

এম্‌নি করিয়া দিনের পর দিন তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিতে থাকে।

মাণিক বড় বিপদে পড়িল।

এক সঙ্গে দু' দিক বজায় রাখিতে চায়। কিন্তু এদিক টানেত ওদিক ছেঁড়ে, ওদিক টানেত এদিক ছেঁড়ে।

টান যেন যমুনার দিকেই বেশী।

মণি কিন্তু ছাড়ে না। পাগলের মত ছুটিয়া ছুটিয়া মাণিকের

পিছু পিছু যায়—আবার ফিরিয়া আসিয়া ব্যর্থ আক্রোশে দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠোকে।

নিজের সর্ব্বনাশ সে নিজের হাতেই করিয়াছে। কাহাকেও বলিবার কিছু নাই।

রাত্রে মাণিক বাড়ী ফেরে। আহারাদির পর শুইতে যায়। মণি তাহার শয়ন কক্ষের দরজায় কাণ পাতিয়া প্রহরের পর প্রহর কাটায়।

সেদিন বাড়ী ফিরিয়া মাণিক ডাকিল,—"যমুনা রাণী!"

যমুনা কাপড় কাচিতে গিয়াছিল, পাশের ঘর হইতে মণি বাহির হইয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখে কোন কথাটি না বলিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া হাঁটু গাড়িয়া হেঁট হইয়া সে তাহার পায়ের কাছে বসিতেই মাণিক ভাবিল হয়ত সে তাহাকে প্রণাম করিবে। হাসিয়া বলিল, "এত ভক্তি যে হঠাৎ?"

কিন্তু প্রণামের পরিবর্ত্তে সিমেণ্ট দেওয়া মেঝের উপর ঠাই ঠাই করিয়া তাহাকে মাথা ঠুকিতে দেখিয়া মাণিক ত' অবাক!

"কর কি, কর কি!" বলিয়া হেঁট হইয়া মাণিক তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে এক রকম জোর করিয়াই টানিয়া তুলিল। মণির শুষ্ক পাণ্ডুর দুইটি গণ্ডের ওপর দিয়া তখন দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতেছে।

মুখখানি দুই হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়া মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, —"কি হ'ল কি তোর মণি ?"

কাঁদিতে কাঁদিতে মণি তাহার জল ভরা চোখ দুইটি তুলিয়া মাণিকের মুখের ওপর তাহার স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল— 'কি হ'ল ? কি হ'ল ? কিচ্ছু হয়নি। তুমি এস।"

বলিয়া মণি তাহার দুর্ব্বল হাত দুইটি দিয়া মাণিককে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ওকে তুমি অমন করে' ডেক না লক্ষীটি!—না না ডাক্‌বে না কেন ? ডেকো। কিন্তু আমার কাছে নয়—আমি যেন শুনতে না পাই।"

"এই কথা !" বলিয়া মাণিক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।— "আচ্ছা, তাই হবে।"

বলিয়া সে যেমন ঢুকিয়াছিল তেম্‌নি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিল।

ভাল লাগে না—

সত্য কথা বলিতে কি—মণিকে তাহার আর ভাল লাগে না।

যমুনা মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকে। সব সময় কথা সে বলিতে পারে না।

মাঝে মাঝে বলে,—'হ্যাঁগা, আমি তোমার সংসারের একটা বোঝা হয়েছি—না ?'

মাণিক আদর করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনে।

বলে,—'দূর পাগ্‌লী!'

বলিয়া একটুখানি থামিয়া আবার বলে, 'এত অসুখ হলো, মলোও না ত' মাগী!'

যমুনা শুধু মুখ টিপিয়া হাসে।

বৈকালে মাণিক সেদিন বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় বলিয়া গেল, 'আমার এই ধুতিটা সাবান দিয়ে কেচে দিও ত!'

মণি, যমুনা দু'জনেই উপস্থিত ছিল, কথাটা যে কাহাকে বলিল ঠিক বুঝা গেল না।

মণি ঝপ্‌ করিয়া কাপড়খানা তুলিয়া লইয়া উঠানের এক পাশে কূয়া-তলায় বসিয়া বসিয়া কাচিবার জন্য নীচে নামিয়া গেল।

যে কূয়া হইতে এক বাল্‌তি জল তুলিবার ক্ষমতাও তাহার নাই।

গাই গরুগুলিকে খাওয়াইবার জন্য 'মাহিন্দার' ছোক্‌রাটি তখন আসিয়াছিল।

মণি বলিল, 'দু'বাল্‌তি জল আগে তুলে দে ত' কালু!'

যমুনা তখন ঘর ঝাঁট দিতেছিল।

উপরের ঘরগুলি ঝাড়িয়া বারান্দায় আসিতেই দেখিল, কাপড়-খানা নাই।

সুমুখে তাকাইতেই নজরে পড়িল, তাহার দিকে মুখ করিয়াই বাঁধানো শানের উপর উবু হইয়া বসিয়া মণি তখন কাপড়ের উপর সাবান ঘষিতেছে।

যমুনার সহ্য হইল না।

বারান্দাটা ঝাঁট দিতে দিতে সেইখান হইতেই মণিকে শুনাইয়া শুনাইয়া জোরে জোরে বলিল, 'বিয়ে-করা ইয়ের কাপড়—তাই উনি গেলেন নিজে কাচ্‌তে।'

শর-সন্ধান ব্যর্থ হয় নাই।

মণি বলিল, 'শুনতে আমি পেয়েছি যম্‌নি, কিন্তু মুখ সাম্‌লে কথা কোস্‌।'

যমুনা বলিল, 'কেন, কারও ভয়ে নাকি?'

মণি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,

'এখন ভয় হবে কেন? স্বামী যখন তাড়িয়ে দিয়েছিল তখন এসেছিলি পায়ে ধরে' কাঁদতে।'

ইহার কি উত্তর দিবে যমুনা প্রথমে কিছু ভাবিয়া পাইল না, তাই সে চুপ করিয়া আবার হেঁটমুখে ঝাঁটা চালাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ এক সময় মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, 'কেন, আবার কি তাড়াবার মতলব আছে নাকি তোর?'

যমুনার মুখে 'তুই' সম্বোধন শুনিয়া মণি আর কোনো প্রকারেই নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। কাপড়টা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার রোগ-দুর্ব্বল কণ্ঠে যতটুকু জোর ছিল প্রাণপণে তাহা প্রয়োগ করিয়া বলিয়া উঠিল,

'বলি হ্যাঁলা, স্বামী কোথা পেয়েচিস্ তুই? বিয়ে তোর দিয়েছে কে? আমিই এনেছি, আবার ইচ্ছে করলে আমিই তাড়িয়ে দিতে পারি। সে ক্ষমতা এখনও রাখি। তা জানিস্?'

ঝাঁটা হাতে লইয়াই যমুনা তর্ তর্ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

মণি বলিল, 'মারবি নাকি?'

যমুনা বলিল, 'তাড়াবি নাকি?'

এমনি করিয়া বচসা তাহাদের অনেকক্ষণ ধরিয়াই চলিল। আশে-পাশে পাড়া-পড়শীর বেড়ার ফাঁকে অনেকগুলা মেয়ে তখন মুখ বাড়াইয়াছে।

রাগের মাথায় মণি সেই অতগুলা স্ত্রীলোকের মাঝখানেই বলিয়া বসিল,

'আসুক্ সে। যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে সে-ই আগে আসুক্।'

কিন্তু যাহার উদ্দেশে কথাটা বলা, দরজার কাছে কখন্ যে সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কেহই তাহা টের পায় নাই। অতগুলা পরিচিত মেয়ের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে তাহার এই স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার অপবাদ সহ্য হইল না। তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলিয়া মাণিক তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই যমুনা ঘোম্টা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মণি ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,

'নাও, এবার হয় ওকেই তাড়াও, নয় আমাকে তাড়াও।'

যমুনার হাতের ঝাঁটাটা সেইখানেই পড়িয়া ছিল। মাণিক তাড়াতাড়ি তাহাই তুলিয়া লইয়া মণির পিঠের উপর সপ্ সপ্ করিয়া দু'ঘা বসাইয়া দিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,

'নে, তবে তোকেই তাড়ালাম।'

পিঠে হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মণি সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

ঝাঁটাটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া মাণিক বলিতে লাগিল,—'ঝগড়া করবার আর জায়গা পাওনি, না? লজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছ,—ছোটলোক মাগী কোথাকার!

রাগের ঝোঁকে কাণ্ডটা করিয়া ফেলিয়া মাণিক আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া উঠানটা পার হইয়া গিয়া উপরে উঠিতেছিল; পশ্চাতে বাষ্পরুদ্ধ করুণ কণ্ঠের মৃদু আহ্বান শোনা গেল,—

'শোনো!'

মাণিক মুখ ফিরাইতেই দেখে,—মণি নিঃশব্দে কোন্ সময় তাহার পিছু-পিছু উঠিয়া আসিয়াছে।

মাণিকের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। মণি একেবারে উন্মাদিনীর মত তাহার আলুলায়িত সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ

চারিদিকে ছড়াইয়া হেঁট হইয়া তাহার পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া একটি প্রণাম করিল এবং তৎক্ষণাৎ মাথা তুলিয়াই বিস্রস্তবসনে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাণিকের মুখের পানে তাহার অশ্রুবিধৌত আয়ত চক্ষু দুইটি স্থিরনিবদ্ধ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, 'চললাম। চিরজন্মের মত চললাম। আর আসব না।'

বলিতে বলিতে গলার আওয়াজ তাহার ভারি হইয়া আসিল, শেষ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না, ঠোঁট দুইটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং সেখানে সে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতপদে দুর্ব্বলদেহে টলিতে টলিতে উঠানটা পার হইয়া গিয়া দরজার কাছে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কোথায় গেল কে জানে।

আজ তিনটি দিন তাহার দেখা নাই।

সেই রোগশীর্ণ দুর্ব্বল দেহ লইয়া কোথায় কোন্ অজানা পথপ্রান্তে হয়ত সে ঘুরিয়া মরিতেছে, অভুক্ত অস্নাত অবস্থায় হয়ত কোন্ অপরিচিত গৃহদ্বারে একটুখানি আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া গেছে, —কিম্বা সে নিষ্ঠুর অপমানের দুঃসহ লজ্জায় অভাগী তাহার জীবনের উপর শেষ যবনিকা টানিয়া দিল কিনা তাই-বা কে জানে।

যাহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য যমুনা একদিন তাহার প্রাণ

পর্য্যন্ত পণ করিয়া বসিয়াছিল, আজ তাহারই এই শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া তাহার আর কিছু ভাল লাগিতেছিল না।

বৈকালে মাণিক বাহির হইয়া গিয়াছিল। সেদিনের আসন্ন সন্ধ্যায় জানালার ধারে একাকী বসিয়া মণির স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসনের কথাটা ভাবিয়া ভাবিয়া যমুনা আজ তাহার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অহৈতুক পীড়া অনুভব করিতে লাগিল।

বাহিরে একটা পুকুরের পাড়ে ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণীর মাথার উপর সূর্য্যাস্তের স্নিগ্ধ আলো! দূরে নিস্তব্ধ পথিকহীন প্রান্তরের ওপারে ধূম্রাচ্ছন্ন কয়েকখানি অস্পষ্ট গ্রাম। সেই দূর দিগন্তের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া যমুনা ভাবিতেছিল, স্বামীর মনে সুখ নাই, কেমন যেন মন-মরা হইয়া দিবারাত্রি সে চুপ করিয়াই থাকে, ঘর-দোর বিশৃঙ্খল হইয়া গেছে, কোনো, প্রকারেই সে তাহার অনভ্যস্ত অপটু হস্তে সবদিক সামলাইয়া উঠিতে পারে না, নিজেকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ, একাকী অনাবশ্যক বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু অভিমানিনী মণি যে আর কোনোদিন ফিরিয়া আসিবে যমুনা কোনোপ্রকারেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না।

আল্‌নার উপর মণির একখানা শাড়ী ঝুলিতেছিল, যমুনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া টানিয়া সেটাকে আল্‌মারির ফাঁকে গুঁজিয়া দিয়া চোখের সুমুখ হইতে সরাইয়া ফেলিল।

সহসা জুতার শব্দে আচমকা তাকাইয়া দেখে—মাণিক।

মাণিকের প্রেমালাপ সেদিন আর সহজে ক্ষান্ত হয় না।

দিনের শেষ আলোটুকু নিঃশেষে মিলাইয়া গেল এবং জানালার বাহিরে পল্লী-সন্ধ্যার নিঃশব্দ গাঢ় অন্ধকার ক্রমশ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল।

যমুনা বলিল, 'যাই এবার। ঘরে সন্ধ্যে দিই, ছাড়ো।'

মাণিক চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'থাক্। দেবে এর পর।'

এমনি করিয়া আরও কিছুক্ষণ কাটিল। তাহার পর রাত্রির মসীবর্ণ ঘন অন্ধকারে কিছুই যখন আর দেখা গেল না, ঘরের ভিতর-বাহির সব যখন একাকার হইয়া উঠিল, যমুনা তখন জোর করিয়া স্বামীর বন্ধন-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, 'আর না।—ওঠো।'

ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া, আর-একটা আলো হাতে লইয়া রান্নার জন্য যমুনা নীচে নামিতেছিল।

অৰ্দ্ধেক সিঁড়ি পার হইয়াছে, এমন সময় রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সহসা মন্ত্রমুগ্ধের মত সেইখানেই সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সুমুখের ধাপে একটি পাও সে বাড়াইতে পারিল না, দেওয়াল ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল,—রান্নাঘরের সুমুখে ঝাঁঝ্‌রি-দেওয়া জানালাটার পশ্চাতে উনানের আগুন তখন গস্ গস্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর সেই রক্তবর্ণ জ্বলন্ত চুল্লীর পাশে বসিয়া আছে—মণি।

কোন্ সময় সে যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে কে জানে।

আগুনের আভায় মুখখানি তাহার সম্পূর্ণ দেখা যায় না; দেখা যায় শুধু আয়ত ছুটি স্নিগ্ধ চক্ষু, তাহারই পাশ দিয়া স্বচ্ছ ক্ষীণ ছুটি অশ্রুর ধারা,—শিখাহীন প্রজ্জ্বলিত অগ্নির প্রদীপ্ত রশ্মিরেখায় প্রতিফলিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মুক্তার মত ঝিক্ মিক্ করিতেছে।

শেষ